KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12	Year of Publication : আশ্বিন ১৩২৫ কার্তিক ১৩২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৌষ ১৩২৫ মাঘ ১৩২৫ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫ Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বাঁশি।

—:*:—

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা—প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেচে। অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্তোর ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখ-দুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কি করে? কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজ্‌চে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশির দৈববাণীতে এ সব বার্ত্তার আভাস কোথায়?

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দ্দা একটঘিানে ড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্চে

কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠ্‌ল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম—তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দু'গাছি মল,—সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ বলে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন্ ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভ্যতার কষ্টিপাথর।

—:*:—

বনে যেমন অনেক রকম ফুল থাকে, যাদের চেহারা দেখলেই তাদের শুঁকতে ইচ্ছে যায়, কিন্তু পরিমল লোভীকে তাদের নিকট হতে শেষে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়, সেইরূপ সাহিত্য-কাননেও অনেক ফুল আছে যাদের বাহ্যিক চাকচিক্যই তাদের একমাত্র সম্বল। সে দিন জনৈক বন্ধুর হাতে ডাক্তার ফারেল লিখিত "Modern man & his Forerunners" বলে একখানি বই দেখলুম। বইটির নাম, মলাট, ছবি প্রভৃতি আমার মনকে গ্রেপ্তার করে বসল। ধার নিয়ে সেটিকে আদ্যোপান্ত পড়লুম। পড়ে কিন্তু লেখকের উপর রাগও হল আর মায়াও জন্মাল। রাগ হল তাঁর অদ্ভুত materialistic মতগুলো দেখে, আর মায়া হল তাঁর ঐতিহাসিক অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে। লেখক পুস্তকের উপক্রমণিকায় বলেছেন যে তিনি ১৫।১৬ বৎসরের গবেষণার পরে বইটি লিখেছেন। যদি তাই হয় তাহলে আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে তিনি যদি ইতিহাস চর্চ্চা ছেড়ে ডাক্তারিতে মনোনিবেশ করেন তাহলে তাঁর পক্ষে ও জগতের পক্ষে মঙ্গলকর হবে।

(২)

লেখক সভ্যতা নামক জিনিসটির ধর্ম্ম নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের নামই হচ্চে

সভ্যতা। যে জাত এ বিষয় যত বেশি কৃতিত্ব লাভ করেছে সেই জাতিই তত বেশি সভ্য। প্রকৃতির উপর আধিপত্যই হচ্চে সভ্যতার কষ্টি-পাথর। কোনো জাতির সভ্যতার পরিচয় নিতে হলে তার এই ক্ষমতার খবর নিতে হবে। ডাক্তার ফারেল আরও বলেন যে দাসত্বই হচ্চে সভ্যতার বনেদ। দাসত্বের উপর ভর করেই সভ্যতার চারুহর্ম্ম্য সর্ব্বস্থানে গঠিত হয়ে উঠেছে। দাসত্ব কোন না কোন আকারে সব সভ্যদেশেই বর্ত্তমান আছে। যে দিন এই মঙ্গলময় দাসত্ব প্রথা উঠে যাবে, সে দিন সভ্যতাও ভিত্তিহীন অট্টালিকার ন্যায় অচিরাৎ ধূলিসাৎ হবে। এইরূপ খেয়ালের চশমা দিয়ে বর্ত্তমান যুগকে নিরীক্ষণ করে যে ডাক্তার সাহেবের মনে কতকটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। জনসাধারণ চারিদিকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার পাবার জন্য চীৎকার করচে, মারামারি কাটাকাটি করচে, বিপুল অন্দোলন করচে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত একচেটে ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্চে। এই সব দেখেশুনে লেখক নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। ফলে সভ্যতার, বিশেষত ইউরোপীয় সভ্যতার, স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মেছে।

(৩)

লেখক সভ্যতার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এবং যে-সামাজিক প্রথাকে সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ রূপে নির্দ্ধারিত করেছেন, প্রকৃত ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে সভ্যতার বিলোপের উপর চোখের জল ফেলবার বিশেষ কোন কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। রুশো (Rousseau) বলেছেন "আমি যদি কোন বর্ব্বর দেশের রাজা হই

তা হলে যে ব্যক্তি সে দেশে সভ্যতার আমদানী করবে ক্ষণমাত্র ইতস্তত না করে তাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবো"। লেখক সভ্যতার যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা পড়ে রুশোর সঙ্গে সায় দেবার একটা প্রবল প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে। জগতের উন্নতি যদি কষাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর দাসের শ্রমার্জ্জিত সম্পদের নাম হয়, তাহলে সে উন্নতির শেষ যবনিকার যত শীঘ্র পতন হয় ততই মঙ্গল। সভ্যতার যদি কোন আধ্যাত্মিক অর্থ না থাকে, তাহলে সে সভ্যতার দ্বারা মানবের অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হতে পারে না। বাহুবলের সঙ্গে যদি নৈতিক বলের বিকাশ না হয়, তাহলে সেটা একটা মহা ভয়াবহ বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

(৪)

লেখক যে সামাজিক অবস্থাকে সভ্যতার পরিচায়ক বলে বর্ণনা করেছেন তার দৃষ্টান্তের জন্য পুরাকালের ইতিহাসের জীর্ণ নথি খোলবার দরকার নেই, একবার বর্ত্তমান জগতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যাবে। এই গত জুন মাসের Edinburgh Revew-এ Mr. W. C. Scully "The Colour Problem in South Africa" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেটি পড়ে বোঝা যায় যে ডাক্তার ফারেল নিরূপিত সভ্যতার গুণনিচয় দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করচে। সেখানে মানুষ প্রকৃতির উপর দৃঢ়রূপে আধিপত্য স্থাপন করেছে, সেখানে শ্রেণীবিভাগ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করচে এবং দাসত্ব তার ক্রূর অট্টহাসিতে দিগন্ত মুখরিত করছে। Mr. Scully

বলেন " within the union limits there is a population of six million souls, only a million and a quarter of whom are Europeans and throughout the greater area comprised by the four provinces—Cape, Transval, Free State and Natal—such a stringent and illiberal colour line is drawn that not alone have the non-European inhabitants, no voice in the management of the country but their social and economic conditions are such as to practically debar them from advancement. Moreover they are subjected to vexations, discriminating laws and are the victims of a deep and growing race-prejudice on the part of the Europeans." দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়, ডাক্তার ফারেল যা চান, তাই আছে। কিন্তু তাই বলেই কি, দক্ষিণ আফ্রিকা সভ্য জগতের শীর্ষ-স্থানীয় বলে গণ্য হবে? এই কি সেই সভ্যতা যার জন্য কোনা মানুষের মত মানুষ অকাতরে আত্ম বলিদান করতে পারে? এই কি সেই সভ্যতা যা নিয়ে আমরা এত গৌরব করে বেড়াই?

(৫)

এই গত ইউরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মাণীর প্রতিপক্ষ দলের লেখকগণ, জার্ম্মাণীকে নানা বিশেষণে বিভূষিত করেন। জার্ম্মাণদের বলা হয় সভ্য-বর্ব্বর (Civilized Barbarian)। কথাটি অর্থহীন নয়, কারণ এর মর্ম্ম সকলেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ কথাটির দ্বারা কি এ সত্যের

প্রকাশ হয় না যে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য ছাড়া অন্য কোন গুণের অস্তিত্ব না থাকলে একটা জাতিকে সভ্য বলে গণ্য করা যায় না। জার্ম্মাণদের মধ্যে বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, বিজ্ঞান ছিল, organization ছিল, কিন্তু তবুও তারা বর্ব্বর। কেন?—প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলবেন যে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, অপরের অস্তিত্বের সত্ত্ব তারা স্বীকার করে না, রাজনীতিতে যে ন্যায় অন্যায় পথ বলে একটা কথা আছে সেটা তারা মানে না, জাতীয় চুরি যে ব্যক্তিগত চুরির ন্যায় দোষনীয় একথা তারা বোঝে না, ইত্যাদি।

(৬)

কি কি গুণের ও ক্ষমতার সমাবেশ একটি জাতির মধ্যে ঘটলে তাকে সভ্য নামে অভিহিত করা যেতে পারে সে বিষয়ে মত ভেদ আছে এবং থাকাও স্বাভাবিক, তবে একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে সভ্যতা নামক বিশেষণটি কেবল বাহুবলের নামান্তর মাত্র নয়। একজন আততায়ী যদি বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে তার পৈশাচিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে সুকৌশলে ব্যবহার করতে শেখে, আমরা তার জন্য তাকে, তার সভ্যতাকে আশীর্ব্বাদ করব না। সভ্যতার সম্বন্ধ পাশবিক ক্ষমতার সঙ্গে নয়—নৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে। বাহুবলের সঙ্গে সভ্যতার সমন্ধ থাকতে পারে কিন্তু সে সম্বন্ধ নিত্য নয়—নৈমিত্তিক। যিশু খৃষ্ট একজন নিঃসহায় ব্যক্তি ছিলেন আর যে Pilate নাকি তাঁকে ক্রুশে টাঙিয়ে ছিল, সে ছিল একজন ক্ষমতাশালী রোম-প্রতিনিধি। রোমের

অতুলনীয় ক্ষমতা তাঁর ইঙ্গিতে চলত। কিন্তু তাই বলে কি Pilate-কে যিশু অপেক্ষা বেশি সভ্য বলতে হবে? ব্যক্তিগত কথা ছেড়ে, জাতির কথাই নিন। নব্যযুগের গ্রীসের বিজ্ঞানবল প্লেটোর যুগের এথেন্স অপেক্ষা অনেক বেশি। এখন গ্রীসে রেল-গাড়ী আছে, মোটর ছুটছে, ষ্টিমার চলছে, তোপ, কামান, বন্দুক, কল-কারখানা সবই আছে, আর প্রাচীন এথেন্সে এসবের কোন চিহ্নই ছিল না। এ সব সত্বেও প্লেটোর এথেন্স কে আমরা নবীন গ্রীস অপেক্ষা বেশি সভ্য বলে মনে করি। এর কারণ কি?—এর কারণ হচ্চে এই যে, প্রাচীন এথেন্সে মানবাত্মার যে বিকাশ হয়েছিল আজকালকার গ্রীসে তার কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। জীবনের মূল উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে এথেন্স যে ব্যগ্রতা দেখিয়েছিল এখনকার গ্রীসে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের চেষ্টা এথেন্সই করেছিল এখনকার গ্রীসে সে চেষ্টা নেই। এবং উক্ত মহান্ উদ্দেশ্যদ্বয়ের অনুশীলনে এথেন্সের যে কৃতিত্ব লাভ হয়েছিল এখনকার গ্রীসের তা স্বপ্নেরও অগোচর। এইজন্যই আমাদের নিকট প্রাচীন এথেন্সের এত কদর। এই একই কারণে আমরা প্রাচীন ভারতকে নব্য ভারত অপেক্ষা এবং গেটের জার্ম্মাণীকে নব্য জার্ম্মাণী অপেক্ষা বেশি মহামূল্য বলে মনে করি।

(৭)

সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যেমন আমাদের অন্তরে বিচার-বুদ্ধি নামক একটা ক্ষমতা আছে, ভালমন্দ প্রশংসনীয় নিন্দনীয় নিরূপণের জন্যও আমাদের সেইরূপ একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিটির

বাঙলা নাম হচ্ছে ধর্ম্মজ্ঞান, আর ইংরাজিতে তাকে বলে "The sense of right and wrong." ক্যাণ্ট সেটাকে Practical Reason বলেছেন। এই কর্ত্তব্য বুদ্ধির দ্বারা যে জিনিসটি অনুমোদিত হয় সেটি হচ্ছে বাঞ্ছনীয়—good. এই বুদ্ধির প্রাচুর্য্য যে জাতির মধ্যে ঘটেছে সেই জাতিই সভ্য আর যে জাতির অবস্থা ইহার বিপরীত, সে জাতিই বর্ব্বর। এই ন্যায়ান্যায় জ্ঞানই হচ্ছে সভ্যতার বিচারক। এর দ্বারা যাচাই করেই আমরা জানতে পারি যে কোন্ জাতি সভ্য আর কোন্ জাতি অসভ্য।

(৮)

কোন্ কোন্ ব্যক্তিগত এবং জাতীয় গুণ প্রশংসনীয়, কোন্ কোন্ গুণ নিন্দনীয়, সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তর মতভেদ আছে। এই মতভেদ-বশত কোন কোন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, morality ও এক রকম রুচি বিশেষ। একই কাজ এক জনের নিকট প্রশংসনীয় এবং অন্য জনের নিকট নিন্দনীয় বিবেচিত হয়। নৈতিক কর্ম্মের মধ্যে এমন কোন সাধারণ গুণ (common element) নেই যাকে সকলেই শিরোধার্য্য করে নিতে পারে। যদি থাকত তাহলে এ বিষয়ে এরূপ ব্যক্তিগত ও জাতিগত মতবৈষম্য দেখা যেত না। ভাল মন্দের বিচারও জ্যামিতির সিদ্ধান্তের মত অকাট্য হত। তাঁরা বলেন আমাদের ভাল মন্দের বিচার কতকটা খাদ্যদ্রব্যের উপাদেয়তার বিচারের ন্যায়। দুই ব্যক্তির মধ্যে যেমন কাঁটাল এক জনের নিকট অমৃততুল্য অনুভূত হয় এবং সেই একই ফল দ্বিতীয় ব্যক্তির বমনেচ্ছা আনয়ন করে, সেইরূপ মাতৃ-হত্যাও কারও নিকট এক বিষম পাপ

রূপে অনুভূত হয় এবং কেউ তাকে একটা প্রশংসনীয় কাজ বলে মনে করে। কাঁটাল সম্বন্ধে রুচির বিভিন্নতা যেমন একটা ব্যক্তিগত জিনিস, মাতৃহত্যা সম্বন্ধে মতভেদও ঠিক সেইরূপ একটা ব্যক্তিগত রুচি-ভেদ মাত্র। সার্ব্বভৌমিক নীতি (Universal moral Law) বলে কোন জিনিস নেই, ওটা একটা অলিক স্বপ্ন মাত্র।

(৯)

এই জাতীয় দার্শনিক এ কথা ভুলে যান যে, যদি কোন রূক্ষ মেজাজের লোক তার এই অদ্ভুত মত শুনে ধৈর্য্য হারিয়ে লাঠি মেরে তাঁকে ঘায়েল করে বসে, তাহলে তিনিই তারস্বরে বলে উঠবেন—লোকটির সাজা হওয়া উচিত। জজ-সাহেব যদি রায়েতে লেখেন যে রুচির বিভিন্নতা দোষণীয় নয়, অতএব আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হোক, তাহলে দার্শনিক ম'শায় ক্ষণমাত্র ইতস্তত না করে বলে উঠবেন, "বড় অন্যায় হয়েছে, সমাজ আর টিকবে না, শীগ্‌গির অরাজকতা আরম্ভ হবে। সভ্যতা এবারে লোপ পাবে," ইত্যাদি। কেউ যদি উত্তরে বলে, "কেন, অরাজকতা এলই বা—ক্ষতি কি?" দার্শনিক অমনই উত্তর দেবেন, "তাহলে বর্ব্বরতা ফিরে আসবে"। তার্কিক যদি বলে, "বর্ব্বরতা এলই বা ক্ষতি কি"? দার্শনিক বলবেন, "মানুষের সুখ চলে যাবে, দর্শন বিজ্ঞান লোপ পাবে, আরও নানা রকম অনিষ্ট হবে"। বোঝা গেল দার্শনিক মশায় ঐ জিনিসগুলিকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। তার্কিক কিন্তু অত সহজে হার না মেনে তাঁর কথাতেই উত্তর দেবে, "যে সে জ্ঞান বিজ্ঞানকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে না। এ সব জিনিস তার নিকট অরুচিকর, এর প্রতিকার কি

কি কর্ব্বেন"? দার্শনিককে তখন বলতেই হবে, "ও-ব্যাটার মাথার দোষ আছে, ওকে পাগলা গারদে পোরা দরকার, না হলে ও বিষম প্রমাদ ঘটাবে ইত্যাদি"। নীতিটাকে আম কাঁটালের সঙ্গে তুলনা করলে তার ফল এই রকমই হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের শত্রু হওয়া দোষণীয়, তা না হলে শত্রুকে জেলে পুরবার আমাদের কি অধিকার আছে? দার্শনিক যদি বলেন, "আত্মরক্ষার জন্য আমরা ও-কাজ করতে বাধ্য"। তার্কিক তখনই বলে উঠবে "আত্মরক্ষার প্রয়োজন কি? আমরা সকলে মরলুমই বা"? তখন দার্শনিককে বাধ্য হয়ে বলতে হবে "জীবনটা বাঞ্ছনীয়, এটা একটা অমূল্য জিনিস। এ থেকে যা পার আদায় করে নেও"।

(১০)

দর্শন বিজ্ঞানের সব কচকচি ছেড়ে দিলে আমরা দেখতে পাই যে, আসল কথা এই যে ভালমন্দ বিচারের একটা ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে এবং আমরা যেটাকে ভাল মনে করি সেটা হওয়া উচিতও মনে করি। ভাল মন্দের জ্ঞানটাকে আমরা রুচিবিশেষ বলে মনে করি নে। যা পাপ তা যে কেউ করুক আমরা সেটাকে দোষণীয় মনে করি। আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান (Practical Reason) বলে, ভাল কাজ সকলেরই করা উচিত আর মন্দ কাজ থেকে সকলেরই দূরে থাকা উচিত। জ্ঞানী যে-কারণে তাঁর বিচার বুদ্ধিকে মানেন, ঠিক সেই কারণেই তাঁর বিবেক বুদ্ধিকেও মানেন। দুটিই মানুষের ঈশ্বর দত্ত অমূল্য ধন, দুটিই সমান শিরোধার্য্য। অবশ্য কোন্ বিশেষ কাজটি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ

সেই নিয়ে মত ভেদ আছে। কিন্তু কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা এ নিয়ে কি মতভেদ নাই? বৈজ্ঞানিকেরা এক সময় পৃথিবীকে চতুর্ভুজ বলতেন আর এখন বলেন সেটা গোলাকার। কিন্তু এ রূপ বিভিন্নতা ঘটেছে বলেই কি আমরা বলতে পারি যে পৃথিবী গোলও বটে আর চতুর্ভুজও বটে? এখন একজন যদি বলে যে রাম তার মাকে খুন করে মহাপাপ করেছে এবং আর একজন যদি বলে যে, না সে অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করেছে, তাহলে এই দুইটি মত কখনো সত্য হতে পারে না। এর মধ্যে একটি সত্য আর একটি মিথ্যা। সত্যাসত্য নিয়ে মতভেদ ঘটলেই যেন আমরা বলে উঠিনা যে, সত্যাসত্য বলে কোন জিনিস নাই। সেইরূপ ভাল মন্দের বিষয় মতভেদ ঘটলেও এ কথা যুক্তিযুক্ত নয় যে, ভাল মন্দ বলে কোন জিনিস নেই। এ সব কথা হচ্ছে ইংরাজিতে যাকে বলে platitude কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের প্রকোপ যখন বড় অসম্ভব রকম বেড়ে যায় তখন platitude হয় আমাদের প্রধান আশ্রয়স্থল।

(১১)

ভাল মানে, হওয়া উচিত। সভ্যতাকে যে আমরা ভাল বলি তার মানে সেটা হওয়া উচিত। আমাদের প্রথম স্থির করতে হবে যে কি কি জিনিস হওয়া উচিত। তারপর দেখতে হবে যে সে জিনিসগুলি কোন সমাজবিশেষে আছে কি না। যদি থাকে তবে সে সমাজ সভ্য আর যদি না থাকে তাহলে সে সমাজ বর্ব্বর। অবশ্য নিখুঁত সভ্যতা perfect civilization কোথাও পাওয়া যায় না। কখনও আমরা perfect state-এ পৌঁছুব কিনা, সে কথা আমি এখানে আলোচনা

করচি নে। আমি এখানে এই বলতে চাই যে perfection-এর একটা নক্সা পরিস্ফুট ভাবেই হোক আর অপরিস্ফুট ভাবেই হোক, আমাদের মনের মধ্যে অন্তরনিহিত আছে এবং সে নক্সার সঙ্গে যে-সমাজের যত বেশি সৌসাদৃশ্য আছে সেই সমাজ তত বেশি সভ্য।

আমি পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করলেই সভ্যতা লাভ হয় না। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে মনুষ্যত্বের বিকাশ যথোপযুক্তরূপে হয় নি বলেই বেঞ্জামিন কিড আক্ষেপ করে বলেছেন—"Civilization has not yet arrived, for that of the West is as yet scarcely more than glorified savagery." সভ্যতার সম্বন্ধও বাহ্যিক সম্পদের প্রতাপের সঙ্গে নয়, মানসিক নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে; দাসত্বের সঙ্গে নয়, সাম্যের সঙ্গে; বিজ্ঞানের সঙ্গে নয়, জ্ঞানের সঙ্গে। যেখানে মানুষের মন ফুলের মত ফুটে উঠেছে, যেখানে তার আত্মা পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে উঠে যাচ্চে, যেখানে দয়া ধর্ম্ম স্নেহ মমতা সমাজকে তাদের সুবর্ণ শৃঙ্খলে ক্রমেই দৃঢ় হতে দৃঢ়তর ভাবে বাঁধছে, সেখানেই প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ হচ্চে। এ সব কথা মামুলি হলেও সত্য।

(১২)

দাসত্ব—সভ্যতার ভিত্তি নয়, ভিত্তি অসভ্যতার। মানুষ আর যে-কোন কাজের জন্য সৃষ্ট হোক, গোলাম হবার জন্য সৃষ্ট হয় নি। সুতরাং যে-সমাজে দাসত্ব আছে, তার সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ আছে। দাসত্বের দ্বারা প্রকৃত সভ্যতা কোনও সমাজে গঠিত হয় নি,

দাসত্ব সত্বেও গঠিত হয়েছে। কলিকাতা, লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় নগরে অসংখ্য বারবনিতার সমাগম দেখতে পাওয়া যায়। এমন বড় সহর নাই যেখানে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তাদের জাল বিছিয়ে না বসে আছে। সমাজের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ চিরন্তন। কিন্তু তাই বলে কি আমরা বলতে পারি যে, উক্ত নগরগুলিতে যা কিছু সভ্যতা দেখতে পাওয়া যায়, তা বেশ্যা-প্রথার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে? ডাক্তার ফারেল দাসত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তাও কতকটা এই শ্রেণীরই যুক্তি।

(১৩)

সভ্যতা সমাজেই সম্ভবপর। সামাজিক-জীবন রক্ষার জন্য যে সব অনুষ্ঠান আবশ্যক সে সবের সংস্থান যে-সমাজে নেই তার সভ্যতাকে lopsided (একরোখা) বলতে হবে। যে সব জিনিসকে সমাজ মূল্যবান মনে করে তাদের রক্ষার ক্ষমতা যদি সমাজের না থাকে, তাহলে আমরা সে সমাজের সভ্যতাকে পূর্ণাবয়ব বলতে পারি নে। এই সমাজিক আত্মরক্ষার জন্য বিজ্ঞান একটি শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতির শক্তিসমূহকে আমরা নিজের বশে আনতে পারি এবং তাদের সাহায্যে সমাজের মঙ্গল সাধন এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারি। এই হিসেবে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার, জাতীয় জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনীয়। আমার মনে হয় এই সামাজিক সত্যটি ডাঃ ফারেলপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাঁরা জীবনের অন্য সব সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে পড়েছেন। জীবনের মঙ্গল দর্শনে তাঁরা এমন মেতে গেছেন যে

এ ছাড়া যে জীবনের আর কিছু আছে, তা তাঁরা একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, জীবন কেবল একটা মল্ল-যুদ্ধ নয়, এটা আত্মার একটা অনন্তকালব্যাপী উন্নতির চেষ্টাও বটে। তাঁরা আত্মার এই মর্ম্মান্তিক মন্ত্র ভুলে গেছেন—"আজ বাহায়েম বাহরা দারম, আজ মালায়েক হাম, আজ বাহায়েম বোগজর তা আজ মালায়েক বুগজরি"। অর্থাৎ—আমাদের মধ্যে পশুও আছে আর ফেরিস্তাও (angel) আছে। পশুত্ব ছেড়ে উঠ, তাহলে ফেরিস্তাদেরও ছেড়ে উঠবে।

ওয়াজিদ আলি।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

—:#:—

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

সে যে কত বৎসর আগে, আজ আমার তা মনে নেই, মনে আমি করতেও চাই নে। এক সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে, ব্যাঘ্ররাজের সঙ্গে বনপথে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি হয়। তখন মাঘ মাস, আমি আমাদের দেশের বাড়ীতে ছিলাম। সেদিন ভোরে গাঁয়ের একজন লোক এসে আমায় খবর দিলে, গাঁয়ের সীমানায় আগের রাতে, তার একটা মস্ত মোষ বাঘে মেরে রেখে গিয়েছে। স্থানটি পরীক্ষা করে জানা গেল উভয় পক্ষের যুদ্ধের কোন চিহ্ন নেই। বাঘটি খুব সম্ভবত লুকিয়ে কাছাকাছি প্রতীক্ষা করে ছিল, ঘাড়ে এসে পড়ে বেচারীকে প্রাণে মেরেছে। মহিষ-সাংস অল্পই সে আহার করেছিল এবং পাশের চষা-ক্ষেতে যে পদচিহ্ন রেখে গিয়েছিল, তাহতে স্পষ্টই জানা গেল—তিনি একটি অসুরবিশেষ। তখন আমার বয়স একেবারেই কাঁচা, তা ছাড়া শীকারীদের উপর, উপরওয়ালাদের কড়া হুকুম যে, আমাকে বাঘ ভালুক শীকারের কোন উৎসাহ না দেয় কিম্বা সাহায্য না করে। সেই জন্যে শীকারীদের সঙ্গে নিয়ে বন পিটিয়ে বাঘটিকে যে ঘেরাও করব, তার কোন আশাই ছিল না। কাছেই একটা গাছে মাচান বাঁধা হল—

আসনটি নিরাপদ হলেও নিঃশব্দ ছিল না, একটু নড়া চড়াতেই ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ করে উঠত। সূর্য্যাস্তের বহুপূর্ব্ব হতেই আমি গিয়ে আসন নিলাম, সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, তিনি না ছিলেন শীকারী, না জানতেন তার কায়দা কানুন। অল্প কালের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে স্নাইপ আর হাঁস আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল, ক্রমে বন-প্রান্তর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে এল, শুধু রাত্রিচর পাখীর ডাকে মাঝে মাঝে সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ক্ষণিকের জন্যে ভঙ্গ হচ্ছিল মাত্র। আকাশে প্রায় পূর্ণ-চন্দ্র, রাত্রিখানি যেন মাজা ফটিক। দুটি একটি বেজি টুক্‌টুক্ করে আসতে লাগল, ভয়ে ভয়ে, থেমে থেমে, মৃত মহিষের কাছে অগ্রসর হবার আগে, গলা বাড়িয়ে চারিদিক বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে নিলে, কিন্তু সেখানে অধিকক্ষণ রইল না। এর পরে দু'একটি শিয়াল দেখা দিলে, আর দলের মধ্যে যার ক্ষুধা কিম্বা লোভ একটু বেশি তিনি আহার সুরু করে দিলেন। আমরা উপর হতে ছোট্ট একটি শুক্‌নো ডাল ছুঁড়ে দিতেই, চম্‌কে উঠে দেদৌড়। অনেকক্ষণ ধরে বলবার মত কোন ঘটনাই ঘটল না। রাত ৯টার পর নদীর ধারে কুকুর ডাকতে আরম্ভ করল, ক্রমে বস্তির কুকুরেরাও তার সঙ্গে যোগ দিলে। এ ডাকাডাকিও অল্পক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল, আর কোন নড়াচড়াও কোন দিকে রইল না, কেবল কাছাকাছি একটা শিমুল গাছ হতে কতক-গুলো শকুন থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল, হাত বিশেক তফাতে বাঁ দিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি বড় জানোয়ারের নিশ্বাসের গভীর শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। বন্ধু আমার ঘাড়ের উপর হাত রেখে, বাঁয়ে যে দিকে দেখালেন বহু চেষ্টাতেও সে দিকে আমার চোখে কিছু

পড়ল না। একটি প্রকাণ্ড বাঘ ঠিক আমাদের মাচানের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিল, বন্ধুর ধ্যাননিশ্চল দেহ আর তন্ময় দৃষ্টি হতেই বোঝা গেল তার সমস্ত মন বাঘটি আকর্ষণ করে নিয়েছে। দুএক নিমেষ সময় মাত্র, বাঘটি মাচানের নীচে হতে খোলা জমিতে বেরিয়ে ধীরে ধীরে মৃত মহিষের দিকে অগ্রসর হতে লাগল কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছিল সে এক অনন্ত যুগ।

সে এক চমৎকার দৃশ্য, সে যখন ধীরগম্ভীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল তখন উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তার হলদের উপর কালো ডোরা-কাটা শরীর, এমন কি গলার কাছের দাড়ীগুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। নিঃশব্দে আমার বন্দুকটি আমি বাড়িয়ে ধরলাম (তখন আমার সেকেলে ধরণের ভারী বন্দুক ছিল), ঘাড়ের কাছটিতে নিশানা করে আওয়াজ করব আর কি, এমন সময় বন্ধু আমার কাপড় ধরে আর একটান দিলেন। সেই লক্ষ্মীছাড়া টানে, আমি তাঁর দিকে ফিরে চাইলাম, প্রবীন ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে, তরুণ শীকারিটিকে 'উপদেশ' দিলেন, "আরে সবুর কর, যখন আহার সুরু করবে তখন মেরো"। হায় হায় আমার অদৃষ্ট! সবুরে মেওয়া ফল্‌লনা! যখন আবার ফিরলাম তখন আমার কামনার ধন অদৃশ্যপ্রায়। প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রতীক্ষা করে রইলাম, এই বুঝি ফিরবে কিন্তু "সে গেল ধীরে"—নাহি এল ফিরে! না আসবার কারণ হয়ত কিছু ঘটেছিল, মাচানটাতে কোন শব্দ হয়ত বা হয়েছিল, কিম্বা বন্ধুর চুপি চুপি কথা জোরে হয়ে গিয়েছিল (চুপি চুপি কথাও আমার কপালে জোরে হল!) যে অনিশ্চিত কারণই হোক, নিশ্চিত এই যে তাঁর দেখা আর পাওয়া গেল না। "মধুনিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে

বার বার, সে বাঘ এল না আর যে গেল ফিরে"। এক শিক্ষা আমার হল, সুযোগ ছেড়ে, আরো ভালো সুযোগের জন্য আর কখনো মুহূর্ত্ত-মাত্র অপেক্ষা করা নয়। আমার দুঃখের বাড়া দুঃখ এই যে, যা করতে পারতাম তা করি নি, আর সেই কথা ভুলতেও পারি নি।

এখন আমি তোমাদের আমার প্রথম ব্যাঘ্র লাভের গল্পটি বলব। এ লাভ এক অপূর্ব্ব আনন্দ, সে আনন্দের সহানুভূতি শুধু শুনে হয়না, নিজের অভিজ্ঞতা থাকলে তবে ঠিক বোঝা যায়। এই ব্যাপারের রঙ্গভূমি ছিল মধ্য-প্রদেশে—রেলওয়ে ষ্টেশন হতে বহুদূরে আমাকে যেতে হয়েছিল। কতকটা পথ গাড়িতে, তার পর টাটু ঘোড়ায়, সব শেষ হাতীতে চড়ে গিয়েছিলাম। এই ভাবে একটি সন্ধ্যা আর সারাটি রাত কাটল। পথে কোথাও থামতে না পারায়, এ যাত্রা বড়ই শ্রান্তিজনক হয়েছিল, যে রমনীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, জ্যোৎস্নালোকে সে পথ আরো সুন্দর হয়েছিল। আমার হাতীকে দেখে একটি রাত্রিচর পাখী ডাকতে সুরু করল, তার তীব্রস্বর সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত করে তুলেছিল, যতক্ষণ আমার হাতী ঘন তরুসমাচ্ছন্ন উপত্যকার গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে না গেল, ততক্ষণ আর সে সুর থামল না। যখন আমি আমার তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছিলাম—তখন পূর্ব্বের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি আর বিলম্ব না করে, শ্রান্ত শরীর কুণ্ডলী পাকিয়ে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল বলতে পারি নে কিন্তু মনে হল যেন, আমি যাঁর অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম, তিনি আমায় বড় বেশি শীগ্‌গির এসে জাগিয়ে দিলেন। শীকারীরা শুভ-সংবাদ নিয়ে এসেছে, যদি বাঘটিকে হস্তগত করতে চাই, তাহলে অবিলম্বে যাত্রা করা

আবশ্যক। বেলা দশটার সময় আবার আমরা গো-যানে যাত্রা করলাম—চৈত্র মাসের রৌদ্র মাথার উপর করে, পাহাড় পর্ব্বত ভেঙে, নদী নালা পার হয়ে, অগ্রসর হতে লাগলাম। শ্রান্ত বলদগুলি বদল করতে যে টুকু থামা আবশ্যক, তার বেশি আর কোথাও বিশ্রাম করা হয় না। শ্রান্তিকর দীর্ঘতম দিনেরও শেষ হয়, রাতটি ভালই কেটেছিল। আমাদের সঙ্গে প্রায়, ১০।১২টি বলদ ছিল, তার অধিকাংশই জরাজীর্ণ, বাঘকে লোভ দেখিয়ে আনবার উদ্দেশে এগুলিকে আনা হয়েছিল। বাঙ্গলা দেশের হিন্দুর মত, মারহাট্টারা বাঘের উদর পূরণের জন্যে গরু বেঁধে দিতে আপত্তি করে না। সে যাই হোক এ গড্ডলিকা প্রবাহ অগ্রসর হয়েই চলল, আবার যখন কোন পাথরের উপর উঠে কিম্বা গর্ত্তের মধ্যে নেমে, আবার উঠে চললে তখন আমাদের এমনি ঝাঁকানি আর ধাক্কা খাওয়ালে যে, তার স্মৃতিচিহ্ন বহুকাল যাবৎ আমাদের বুকের পাঁজরে দেহের হাড়েহাড়ে সজাগ রয়ে ছিল। রাত দুই প্রহরে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, জেগে দেখি গাড়ী নালায় গড়াগড়ি যাচ্ছে আর আমি খদে গড়িয়ে চলেছি!

গাড়ীর বলদগুলো প্রাণভয়ে প্রাণপণে দৌড় দিয়েছিল, কারণ গাড়ীর পিছনে যে সব বুড়ো বলদ বাঁধা ছিল, তারি একটার উপরে বাঘ এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল—অনেকক্ষণ হতেই খুব সম্ভবত এ পিছু নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। জেগে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল, যমপুরীর রৌরব তার কাছে কোথায় লাগে! চীৎকার, বিলাপ, ক্রন্দন, হায় হায়, আক্রোশ, আক্ষেপ, এবং কপালে করাঘাত। আমার নাক দিয়ে কিঞ্চিৎ রক্তপাত ছাড়া আর বড় বেশি কিছু ক্ষতি

হয় নি। আবার সকলের যাত্রা করবার মত সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসতে কিছুক্ষণ সময় গেল, সূর্য্যোদয়ের অল্প পরেই আমরা তাঁবুতে পৌঁছিলাম। পথে আর কোন বাধা বিঘ্ন হয় নি। কিছুক্ষণ পরেই সুসংবাদ কর্ণ-গোচর হল,—"গারা হোগিয়া"—অর্থাৎ বাঘে শীকার ঘায়েল করে গিয়েছে, আমাদের তাঁবু হতে বেশি দূরে নয়—কাছেই। প্রাতরাশের পূর্ব্বে কিম্বা পরে, মৃগয়াযাত্রা হবে সেই বিষয়ে তর্ক উঠল। মীমাংসা হল যে, পূর্ব্বে যাত্রাই সমীচীন। মহারাষ্ট্রীয় খাদ্য সম্বন্ধে যাঁদের রসনার অশিক্ষিত পটুত্ব নেই—তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ, "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও"।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল, আমরা মৃগয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম। বন্দুকধারী শীকারী সবেমাত্র দুজন, আমি আর আমার বন্ধু। এছাড়া বন্ধুর অনুচরবর্গ, নানা যুগের নানা আকারের বন্দুক ঘাড়ে করে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকজন গাছে উঠে বসেছিল—বাঘ যদি পালাবার চেষ্টা করে তাহলে যে কোন উপায়ে তাকে পথে আনাই তাদের কাজ। এগিয়ে যে, জায়গাটি বেছে নিয়েছিলাম, তার একটু বিশেষত্ব ছিল। সেখানে দাঁড়িয়েই চারিদিকে দৃষ্টি চলে। মাচানে উঠব না স্থির করেই, এই স্থান আমি মনোনীত করে ছিলাম। আমার গায়ের কাছে, উত্তর দক্ষিণে, গুল্ম-সমাচ্ছন্ন তৃণ-বিরল সঙ্কীর্ণ পথ। শীকার যেদিক হতে আসবে, সেদিকে ১০০ হাত পর্য্যন্ত আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। যদি বাঘটি আমার দিকে আসত, তাহলে সেই পথে যে ঘন সবুজ চারা গাছের সারি ছিল, সেখানে গা ঢাকা দিয়ে সহজেই আসতে পারত। অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারীদের সোরগোল বেশ

শোনা গেল। একটা দাঁড়কাক, পাশের একটা পলাশ গাছের উপর উড়ে এসে জুড়ে বসে, মুখ ফিরিয়ে গাছের নীচে কি দেখে কে জানে, কেবলি গাল পাড়তে লাগল। দেখতে পেলাম, একটা গাছের পাশ-হতে নুয়ে-পড়া ডালের ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে নিঃশব্দে একটি বাঘ আসছে। তখনও সে অনেক দূরে, দেখে বুঝলাম বাঘ নয় বাঘিনী, ঘাড় নীচু করে এগিয়ে আসছিল বলে সহজেই আমি তার ঘাড় লক্ষ্য করে আওয়াজ করলাম। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে মাতালের মত টলতে টলতে চলতে লাগল। আমি দুটো গাছের ফাঁকের মধ্য দিয়ে আবার আমার দোনলা বন্দুকের বাঁ নলের গুলিটা ছুড়লাম। যত দূর সম্ভব সে সবুজ গাছের সারির ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে এসেছিল, আমার বাঁয়ে পৌঁছবামাত্র আমি গুলি করি। আবার সে পড়ে গেল, আর একবার উঠবার চেষ্টা করে পারল না। তখন মাটীতে শুয়ে পড়ে গর্জ্জাতে লাগলে। আমি গাছের আড়ালে চুপি চুপি যতখানি পর্য্যন্ত এগোন নিরাপদ মনে হল, ততখানি পর্য্যন্ত গিয়ে, দুটো ডালের ফাঁক দিয়ে শেষ সংঘাতিক গুলিটি মারলাম। সামান্য কি এক আওয়াজে সে আমার উপস্থিতি জানতে পেরে, চোখ দুটো আগুনের গোলার মত করে, আবার হুঙ্কার দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু শরীরে আর শক্তি ছিল না বলে পারলে না, পরমুহূর্ত্তেই আমি তাকে আত্মবশে আনলাম। সেই বিজয়-গৌরবে আমার সর্ব্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চার হয়েছিল, আজও তার প্রভাব অন্তর্হিত হয় নি। যখনি সেদিনের কথা মনে করি, আমার শরীর-মনে সেই তীব্র আনন্দ তেম্‌নি করে আবার জেগে ওঠে।

একটা কথা বলে আজকার চিঠি শেষ করব। আমি যে স্থানটি মনোনীত করে, বাঘের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম, সেই পথে আসা ছাড়া তার আর অন্য উপায় ছিল না—কেন না "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যান,

বাঘের কথা আমার এখনও শেষ হয় নি, আর যতদিনে জরা-গ্রস্ত হয়ে, অকর্ম্মণ্য হয়ে না পড়ি, ততদিনে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজের অবসরে সেই সব শীকারের ব্যাপার আমি মনের মধ্যে, আবার অভিনয় করবার সুযোগ পাই, আর তখনি তোমাদের জন্যে সেগুলি লিখে সঞ্চিত করে রাখি। যাই হোক দেখি, এসব পুরানো কথা, তোমাদের কাছে কখনই পুরানো হয় না। আমি তোমাদের কাছে শীকার-সামন্ত সমীর খাঁর কথা বলেছি। এক সময় পুলিশ পাহারাওয়ালার কাজ তাকে করতে হত। সৌভাগ্যবশত, একদিন সে একজন মস্ত কর্ম্মচারীর সুনজরে পড়ে যায়—তিনি তাকে একখানি ছোট খাট জায়গীর দান করেন। এই সংস্থান হবার পর সে শীকার ব্যবসায়ে তার শরীর-মনের সব অধ্যবসায় নিয়োগ করে'

ব্যবসায়টি বিশেষ লাভজনক করে তুলে ছিল। তার মত আর কাউকে অমন ব্যাঘ্র মহিষের খবর আনতে ও তাদের খুঁজে বার করতে দেখি নি। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯০২ সালে, তখন সে দাঁত-পড়া বুড়ো, তবে শরীরে তখনও শক্তি ছিল, এতখানি বয়সেও শীকারের আগ্রহ তার যায় নি, রাত ৪টের সময় প্রতিদিন সে আমার তাঁবুতে আসত, দুয়ারে দাঁড়িয়ে একটুখানি আস্তে কাশলেই আমার সজাগ ঘুম ভেঙ্গে যেত। তারপর আমি, সমীর আর সমীরের চিরসঙ্গী একজন গোঁড়, এই তিন জনে বন্দুক ঘাড়ে বেরিয়ে পড়তাম। বনের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাঘ ভুলিয়ে আনবার জন্যে যে সব গরু বেঁধে রাখা হত, রাতের মধ্যে তাদের কার কি অবস্থা হল তাই আবিষ্কার করাই এ যাত্রার উদ্দেশ্য। রাত আর দিনের এই সন্ধিক্ষণেই বাঘ ভালুক সম্বর প্রভৃতি জন্তু রাত্রি ভ্রমণ শেষ করে' আপন আপন গুহা গহ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করে। সমীর খাঁর মত চতুর পথ প্রদর্শক সঙ্গে না থাকলে, একেবারে তাদের মুখে গিয়ে পড়া, কিছুই বিচিত্র নয়।

ঘাসবনে হরিণের স্বচ্ছন্দ পদধ্বনি, ভালুকের ধীর মন্থর পদ-ক্ষেপের প্রভেদ অনায়াসেই বোঝা যায়, আর বাঘের পদশব্দের সঙ্গে এদের ভুল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। এক বিড়াল ছাড়া আর কোন জন্তু বাঘের মত অমন মৃদু ধীর নিঃশব্দ পা ফেলে আসতেই পারে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন ক্রমেই পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছিলাম, সমীর খাঁ তখন চুপি চুপি দুএকটি কথা কিম্বা সঙ্কেতে আমায় সতর্ক করে দিচ্ছিল। কিন্তু যখন বন-রাজ্যের সামান্য প্রজা, যথা মার্জ্জার, জম্বুক, সে পথে দেখা দিচ্ছিল তখন আর সমীর

খাঁ কিছুমাত্র সম্ভ্রম দেখায় নি, আর তাদের সম্বন্ধে এমন সব ভাষা প্রয়োগ করছিল যা তোমাদের না শোনাই ভাল। যে পথে বাঘ ভালুক সচরাচর আসা যাওয়া করে, সে পথ এড়িয়ে, বেশি দূর নিরাপদ স্থান হতেই, আমাদের বাঁধা গরুগুলির সন্ধান নিয়েছিলাম। ভোরের অস্পষ্ট আলোকে অনেক সময়ই কিছু দেখা যেত না, বিশেষ যখন গরুগুলি শুয়ে থাকত কিম্বা যদি বাঘ তাদের মেরে ফেলে রেখে যেত। বিশেষ কাছে যাবার আগে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল হতে, গাছের ডালে চড়ে লুকিয়ে বসে, কিম্বা কোন প্রকাণ্ড পাথরের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে, পাখী কিম্বা জন্তু কোথায় কে কি শব্দ করছে, তাও ভাল করে লক্ষ্য করে, তবে কাছে এগোন হত। আগের দিন কতকগুলি স্ত্রীলোক জঙ্গলে মহুয়া কুড়োতে এসে, পাহাড়ে নদীর ধারে একটি বাঘ দেখতে পেয়ে, তাঁবুতে আমাদের কাছে এসে খবর দিয়ে গিয়ে ছিল। তখন বেলা পড়ে এসেছে, চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি আমরা বনের চারিদিকে ব্যাঘ্ররাজের নজর স্বরূপে গুটিকত গরু বেঁধে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটি যে তিনি গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণও অবিলম্বে পাওয়া গেল। পাশেই একটি নালা ছিল, আর সেখানে নামবার পথটি একেবারে খাড়া। কিন্তু এ অসুবিধা এড়াবার জন্যে গরুটিকে টেনে সে নালার কতক দূর নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নালার ধারে ধারে নেমে গিয়ে বাঘটিকে তখনই শীকার করে ফেলবার পরামর্শ সমীর খাঁ আমায় দিয়েছিল, আমারো যে সে প্রলোভন হয় নি তা বলতে পারি নে, তবে সেটা আমি সম্বরণ করেছিলাম। আমি যাঁর অতিথি, তাঁর অজানিতে এ কাজ করা ঠিক হত না। নালার ধারে ধারে লুকিয়ে বসবার মত,

গুটিকত জায়গা ছিল, কোন কোন শীকারী তখনি সেই সেই খানে উঁকি দিয়ে বাঘ কোথায় আছে তার সন্ধান নিতে চেয়েছিল কিন্তু দরকার হল না। পাশেই গজ পঞ্চাশ' দূরে, মহুয়া গাছে বসে একটা ময়ূর সে সংবাদ আমাদের জানিয়ে দিলে—পতিব্রতা ময়ূরীরাও চারিদিক হতে তার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল 'ঠিক্ ঠিক্'। আমরা আর কিছু গোলযোগ না করে, মহানন্দে বাঘের শুভাগমনের সংবাদ নিয়ে তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথম বারে বাঘ আমাদের ফাঁদে পড়ে নি, পাহারাওয়ালাদের মাঝ দিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে পালিয়ে ছিল। হঠাৎ চারিদিকে তাদের আনাগোণার শব্দ যে কেন থেমে গেল, আমরা সে কথা বুঝতে পারি নি, সমীর খাঁ ফিরে এসে তাড়াতাড়ি আমাদের ঠাঁই বদল করিয়ে দিলে। কাছেই জঙ্গলের ঘাস পোড়ান ছাই-এর উপর বাঘের পায়ের দাগ দেখা গিয়েছিল। আমাকে নালার ওপারে গাছের নীচে জায়গা দিলে। বাঘ যে-পথে আসবে সে-পথের ঘাস উঁচুতে ছিল প্রায় তিন ফুট,—একটি গলিপথ নালার ধার পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ প্রায় বিশ হাত সোজা নালার মধ্যে নেমে তার পাশের পাহাড় মুখো উঠে গিয়েছিল। আমাদের শীকার-কর্ত্তা মাচানের উপর আসন করেছিলেন, তাঁর আপনার শীকারীর মতে সেইটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থান। এই শীকারিটিকে দেখলে, নিতান্ত হতচ্ছাড়া বদমায়েস ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু সমীর খাঁ শীকারতত্ত্ব জানত ভাল। এবারে বাঘটিকে নিঃশব্দে ঘেরাও করা হবে তারি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, দামামা কাড়া বাজবে না, শীকারীরা চুপচাপ আসবে, কেবল 'এগিয়ে আসছে' এই খবরটা জানাবার জন্যে মাঝে মাঝে শুধু গাছ কিম্বা পাথরের গায়ে কুড়লের

ঘা দেবে। আমি আমার দু'জন শীকারীর সঙ্গে আগে হতে ঠিক করে ছিলাম, তারা গাছ হতে ইসারা করে বাঘের গতিবিধি আমায় জানাবে। একজন শীকারী পাগড়ী নাড়াল দেখে বুঝতে পারলাম, বাঘ সোজা আমার দিকেই আসছে। দুএক মুহূর্ত্ত পরে প্রকাণ্ড জন্তুটিকে ঘাসের মধ্যে দিয়ে গজ সত্তর দূরে আমার দিকে আসতে দেখতে পেলাম। ঘাসের সেই সামান্য আড়ালের সমান হয়েই সে পিঠ নীচু করে এগিয়ে আসছিল। সমুখে পিছনে পাশে ১৫ গজ পরিমাণ জমিতে ঘাস দুলে দুলে, নদীতে নৌকা চলে যাবার পর, ঢেউ-খেলান যেমন একটি পথের চিহ্ন পড়ে, ঠিক তেম্নি দেখাতে লাগল। মাথা নীচু করে আসছিল তাই মাথার আড়ালে বুক ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। মাথায় গুলি মারবার পক্ষপাতী আমি নই। বাঘের মস্তিষ্কাংশ থাকে মাথার পিছন দিকে, তাই গুলি অনেক সময় তত দূর অবধি, সহজে পৌঁছয় না। ক্রমেই এগিয়ে আসছে, ত্রিশ হতে কুড়ি, কুড়ি হতে দশ গজ' কাছে এল, তবুও যে ভাবে আসছিল তার কোন বদল হল না। আমরা দু'জনেই শীকার এবং শীকারী সমান উঁচুতে ছিলাম, মাঝের ব্যবধান শুধু সেই সঙ্কীর্ণ নালা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঘাসের মধ্য হতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে নালায় নামতে আরম্ভ না করলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আমার নিঃশ্বাস আর গুলি দুই রোধ করে রেখেছিলাম। তার স্কন্ধ আর মস্তকের সন্ধি স্থলে একটি গুলি খেয়ে সে চমকে লাফিয়ে উঠে নালার মধ্যে পড়ে গেল। কুকুর যেমন পিছনের পায়ে ভর করে, সমুখের পা বিছিয়ে, তারি উপর মুখ রেখে বসে, সেও ঠিক তেম্নি ভাবে পড়ে মাথাটা একবার এদিক, একবার ওদিক নাড়াচ্ছিল, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর মত একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। ঘাড়ের পিছনে আর

এক গুলি খাবার পর মাথা নাড়াও বন্ধ' হয়ে গেল, মনে হল সম্মুখের ডানদিকের থাবার উপর মাথা রেখে সে অঘোরে ঘুমচ্ছে। গৃহস্বামীর শীকারী, তার প্রভু বাঘ পেলেন না দেখে ভারী চটে গেল। সে আর সমীর খাঁ পরস্পরের প্রতি নানা রূপ সাধুভাষা প্রয়োগ করতে লাগল, এর মধ্যে তার মনিব আবার একটা অবিবেচনার কথা বলে ফেলাতে ব্যাপারটা ক্রমে গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। রাজার শীকারী বিদ্রূপ করে বললে, সমীর খাঁ আমায় সব চেয়ে ভাল জায়গাটি দিয়েছিল। সমীর তাকে বললে, "তুই একটা কুলি, তা না হলে বুঝতে পারতিস যে, বাঘকে বলদের মত ল্যাজে মোড়া দিয়ে চালান যায় না"। পরের দিন সমীর খাঁ তাদের উপর শোধ তুললে, আমার কপালে আর একটি বাঘ জুটে গেল। যে নালাতে আগের দিন বাঘটি তার শীকার-করা গরু টেনে নিয়ে গিয়ে ছিল, ঠিক তারি পাশাপাশি সোজা লাইনে নদীর একটি শুক্‌না খাল ছিল, সেই পথ ছাড়া বাঘের আর অন্য রাস্তা ছিল না। আগের দিন আমার অদৃষ্টে ব্যাঘ্র জুটেছিল বলে রাজা এসে নালার মুখে, যে দিক ছাড়া বাঘের আসবার ভিন্ন পথ ছিল না, সেই স্থানটি আগেভাগে দখল করে বস্‌লেন, এতে অন্যায় কিছু ছিল না, ঠিকই করে ছিলেন, তবে করবার ধরণটি ভদ্রোচিত হয় নি। তাঁর এই বে-শীকারী ব্যবহার সমীর খাঁর আদপেই পছন্দ হয় নি। যদিও বাক্যে বা ইঙ্গিতে, তখন কিম্বা পরে, সে তার মনোভাবের কোন আভাস কখনো দেয় নি। একটা জায়গায় সেই নালা হতে আর একটি নালা বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্কীর্ণ পথ সমীর খাঁর শ্যানদৃষ্টি এড়াতে পারে নি। ঠিক সেই খানটিতে সে একজন শীকারীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছিল, এই ব্যক্তি বাঘের পথরোধ করে, তাড়া দিয়ে তাকে

আমার দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে, এই ছিল তার মতলব, ঘাসের মধ্য দিয়ে ব্যাঘ্রটী অগ্রসর হচ্ছিল, তার বৃঢ়োরস্ক ঘাসের জঙ্গল ছাড়িয়ে ঘাসের উপরে উঠেছিল। খোলা মাঠের সীমানায় এসে একবার সে স্থির হয়ে দাঁড়াল, ঠিক আমার সম্মুখটিতে, পিছনে তার বনভূমির বিচিত্র শ্যাম যবনিকা, চিত্রপটে আঁকা, মূর্ত্তিমান মহিমার মত সে ছবি গম্ভীর ও সুন্দর। মুহূর্ত্ত কাল এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্চল নিবিষ্ট, মনে হ'ল যেন অনাবৃত প্রান্তরে পদার্পণ করবার আগে, শব্দ অনুসরণ করে আপন গন্তব্য পথ স্থির করে নিচ্ছে। তার বিস্তৃত শুভ্র কবাট বক্ষ, আমার সম্মুখেই প্রসারিত, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বন্দুকের আওয়াজ হ'বামাত্র সে হাঁটু গেড়ে পড়ে গিয়ে, পরের মুহূর্ত্তেই আবার পিছনের পায়ে ভর করে দাঁড়াল, সম্মুখের পা দিয়ে আঁচড়ে যেন আকাশ চিরে ফেলবে! রাগে অধীর হয়ে আপন বুকে কামড় দিতে লাগ্‌ল, এইবার তাকে আগের চেয়ে আরো ভয়ানক অধিকতর বিস্ময়জনক মনে হয়েছিল। ডাইনে আর বাঁয়ে অনবরত স্নাইপ মারতে হলে যত শীগ্‌গির গুলি চালাতে হয়, ততটুকু সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় গুলি খেয়ে সে মৃত্যুশয্যায় ধরাশায়ী হ'ল। সন্ধ্যার সময় আমি যখন তাঁবুর বাহিরে বসে ছিলাম সমীর খাঁ

"Whispered there in the cool night air
What he dared not day by day light."

কথাটি হচ্ছে—তারি কৌশলে বাঘ আমার পথে এসেছিল, রাজার শীকারীকে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, মশা মারতে গালে চড়" শেখাবার জন্য সে এ কাজ করে ছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯

হাওদা-শীকার।

"হাতীপর হাওদা"—আবার তার উপর নিজে রাজার মত বসে শীকার করতে খুব আরাম। হিমালয়ের তরাই, আসাম আর শ্রীহট্টের জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, মহিষ, সাম্বর, হরিণ প্রভৃতি বড় বড় শীকার, এমন কি তিতির প্রভৃতি ছোট শীকার করবারও এই একমাত্র উপায়। এই সব জায়গায় ঘন জঙ্গল যেন লম্বা ঘাস আর শরের গভীর সমুদ্র; এ ঘাস এতই লম্বা যে মাঝে মাঝে হাওদা ছাড়িয়ে ওঠে, আর এম্নি ঘন যে, সম্মুখে যে সব প্রকাণ্ড হাতি, শীকার সন্ধানে আরোহীকে নিয়ে অগ্রসর হয়, তাদের একেবারে চোখের আড়াল করে ফেলে। প্রতি পদেই গতিরোধ হয়, আর হাতীর পায়ের চাপে যে সব ঘাস ভেঙে পড়ে, সে এম্নি মজবুত যে ভাঙবার আওয়াজটা পিস্তলের শব্দের মত শোনায়। এই উপায়ে প্রথম যেদিন আমি শীকার সন্ধানে গিয়ে ছিলাম, সে কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে—এ যেন বিচালীর গাদায়—হারাণ-সূচ খুঁজতে যাওয়া, তবে মস্ত এই প্রভেদ যে একে যে খুঁজতে যায়, তার নিরাশ হতে হয় না—যার আশায় "ঢুঁড়ত ফিরি" তাকে ঠিক পাওয়া যায়। চলন্ত হাতির উপর দোল খেতে খেতে তাক্ ঠিক্ রাখা অভ্যাস হতে একটু সময় লাগে, আর তা ছাড়া ঢেউ এর মত দোলায়মান ঘন ঘাসের মধ্যে কোন জানোয়ার চলে বেড়াচ্ছে, সে কথা ভাল করে বুঝতেও বিশেষ অভ্যাস আবশ্যক। হাওদা-শীকার ব্যয় সাধ্য—খুব কম লোকেরি এ রকম হাতি রাখবার সামর্থ্য হয়—আর যে দু চার জন রাখেন তাঁরাও এ সব হাতীকে

রীতিমত শিক্ষা দেবার কষ্ট স্বীকার করেন না, এ ব্যাপারে গুটিকত রীতিমত শিক্ষিত হাতি নিতান্তই দরকার, আর এ রকম একটি হাতি পাওয়া সহজ নয়, যদি পাওয়াই যায় তাহলে তার দাম দিতে যে সোনার খনি উজাড় করে ফেলতে হয়, তাই বা ক'জনে পারে? হাওদা শীকারে কৃতকার্য্য হতে হলে, এই রকম হাতি অন্তত ২৪, ২৫টি নইলে চলে না—কাজেই বুঝেছ, আলাদিনের অপূর্ব্ব প্রদীপ যার নাই, তার ভাগ্যে এ শীকার ঘটা দুঃসাধ্য।

এক সময়ে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্য আর প্রদেশের চেয়ে শীকার ব্যাপারে বেশি উন্নতি করেছিল। দেশের জমিদারদের মধ্যে এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শীকার তাঁরা পৌরবের কথা মনে করতেন, আর এই সূত্রে পরস্পরে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এখন আর সেদিন নেই বল্লেই হয়। বর্ত্তমান জমিদারবর্গ অনেকেই পাশ্চাত্য আহার বিহারে, বিলাস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছেন। কলপ-দেওয়া কড়া কামিজ 'কলার' ধারণ, তাঁরা মুনি ঋষির কৃচ্ছ্র সাধনের মতই অপরিহার্য্য মনে করেন। ব্যামিশ্র নিষিদ্ধ আহার্য্য, সনাতন স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অপেক্ষা লোভনীয় হয়ে পড়েছে। যে সকল উগ্র পানীয়, এক সময়ে কেবল মাত্র ঔষধার্থে ব্যবহার করবার বিধি ছিল, এখন সে সকল সেবন তাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের মধ্যে করে নিয়েছেন, আর তার অপরিমিত ব্যবহারই পৌরুষ বলে জ্ঞান করেন। নিঃশব্দসঞ্চার মখমল মোড়া হাওয়া-গাড়ী ব্যতীত চলা-ফেরা করতে তাদের মন ওঠে না। এই গুলি হচ্ছে আধুনিক জমিদারবর্গের আধ্যাত্মিক পরিমাপ—দৈহিক মাপটি তাদের ইংরাজ দর্জ্জির কাছে পাওয়া সহজ। এঁদের তরঙ্গায়িত বরবপু গুলি কোট প্যাণ্টে সাম্য করে রাখা

তাদেরই কর্ত্তব্য। কোথায় কখন কি ভাবে এ সৌন্দর্য্য ফেটে পড়বে, তার জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। একবার, দরবারে একজন রাজকীয় কর্ম্মচারী কোনো জমিদার রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"রাজা একটি সিগারেট খাবে কি"? আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত এই হঠাৎ-নবাবটি বলে উঠলেন,—"আমি শুধু হাভানা ব্যবহার করে থাকি—(হাভানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা দামী চুরুট)। আজ কালকার দিনে ম্যানিলা (Manilla) আর মিউরিয়ার (Muria) প্রভেদ বুঝতে পারাই হচ্ছে সভ্যতার ও শালীনতার বিশিষ্ট পরিচয়; বিবিধ মদ্যের জাতি, গোত্র, গাঁই কুলজি, জ্ঞান যদি থাকে, তাহলে সেত ইংরাজী কিম্বা সংস্কৃত সাহিত্যের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক অধিক গৌরবের পরিচয়। বাক্যালাপ অধিকাংশ সময়ই অতি অকথ্য বিষয় সম্বন্ধেই হয়ে থাকে। যদিও এঁরা ছুরি কাঁটায় খাবার কায়দাটা খুব ভালই শিখে নিয়েছেন, তবু পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ প্রভাবের বাহিরে পড়ে থাকায় তার শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ সর্ব্বদা কেবল মাত্র বাহ্যাড়ম্বর ও আস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে এঁরা দিন দিন অকর্ম্মণ্য ও হীন-চরিত্র হয়ে পড়েছেন। মাঝ হতে রাজ-সুলভ মৃগয়া ব্যবসায়ের সমাদর চলে যাচ্ছে।

হাওদার উপর কোন কোন শীকারীর অভ্যাস আছে, অনেকগুলি করে গুলি-ভরা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যান, তাতে নানান দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। আমার মনে আছে যে, একজন অল্পবয়স্ক জমিদার এই অভ্যাস-বশত মারা যান। হাতি যখন উপরের দিকে উঠছিল, বন্দুক গড়িয়ে পড়ে আওয়াজ হয়ে যায়, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভ্যাস করলে

একটি বন্দুক রেখে আর একটি তুলে নিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, তাতেই অনায়াসে সেটিতে গুলি ভরে নিতে পারা যায়। আর যে বন্দুকটি সর্ব্বদা ব্যবহার করে করে একেবারে আপনার হয়ে গিয়েছে, তার কাছে যেমন কাজ পাওয়া যায়, নতুন অজানা বন্দুকের কাছ থেকে তা হ'বার যো নেই। আর একটি কাজ কখনো করো না; সম্মুখে ঘাস শুধু নড়ে উঠেছে বলে, জন্তুটিকে যতক্ষণ না স্বচক্ষে দেখতে পাও, ততক্ষণ বন্দুক ছুঁড়ো না। হাওদা শীকারের লাইন বাঁধবার দুটি নিয়ম আছে—তার মধ্যে একটা হচ্ছে সূর্ত্তি খেলে, যার যেমন নাম উঠবে, সেই ভাবে সাজান, কিম্বা শীকারের দলপতি আর সকলে যাঁর নিমন্ত্রিত অতিথি, তিনি যে ভাবে দল ভাগ করে দেবেন, সেই মত সাজান। এই সারি-বাঁধাটা ধনুকের আকারে করা ভাল। পাশের জায়গা হচ্ছে শীকারের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধা-জনক। পতাকার সঙ্কেতে, এগোতে, পিছতে, সারিটা প্রশস্ত কিম্বা সঙ্কীর্ণ করে নিতে হয়। দুএক জন শীকারীকে সম্মুখে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে শীকার জড় করিয়ে নিলে বেশি সুবিধা হবে। কোথায় কি ভাবে এ সব হাতি সারি বেঁধে দাঁড়াবে, সে বিষয় স্থির করতে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক। তার পরে বাঘ এসে পাশ কাটিয়ে না পালিয়ে যায়, কিম্বা এই সব হাতির উপর এসে না পড়ে সে সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্যে সাহস এবং চাতুরী দু-ই কাজে লাগান দরকার। অনেক সময় এমনও হয় যে, বাঘ গুঁড়ি মেরে বসে থাকার দরুণ অন্তত সেই সময়ের জন্য চোখে পড়ে না। সব সময়েই যে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য উদ্ধার হয় তা নয়, কেন না বাঘ যেম্নি এই হাওদাধারী হাতিটিকে দেখে, আর অম্নি চার পা তুলে লাফিয়ে ছুটে আসে।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাঘ যখন আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে আসে, সে বড় চমৎকার দৃশ্য, দেবতারা দেখলেও খুসি হয়ে যান। এস্থলে শুধু হাতিটি নির্ব্বিকার হলে চলে না—শীকারীর গুলিটিও অবিকল সোজা চলা চাই, তবেই বিপদ এড়ান যায়। গুলি না ছাড়লে ত শীকার মরে না, আর সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা করা চলে না, গুলি ছুঁড়তেই হয়, তা তোমার লক্ষ্য যেমনই হোকনা কেন, গুলি ফস্‌কে গেলেও এ সময় কাজ হয়। কেননা শব্দ শুনে অনেক সময় বাঘ পালিয়ে যায়, কারো ক্ষতি করবার সুবিধা পায় না।

এ সব জায়গায় বাঘ কোথায় খুন খারাবী করেছে এ সংবাদ না পাওয়া গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন, হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলেও এই ঘন ঘাস জঙ্গলে, সে খবর জানতে দুএকদিন চলে যায়। যখন দেখা যায় মস্ত মস্ত শকুন, চক্র করে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, অথচ ঘাসের মধ্যে নামছে না, কিম্বা ভয়ে নেমে লাফিয়ে পালাচ্ছে না, তখনি বোঝা যায় খুনী ব্যাঘ্রটি কাছাকাছি কোথাও আস্তানা নিয়েছে। এই দস্যুটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে গরু ভেড়া বেঁধে দিলে অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধন হতে দেখেছি—এই উপায়ে একবার চমৎকার একটি বাঘিনাকে হস্তগত করা গিয়েছিল।

এই হাওদা শীকারের প্রধান বিপদ জলাভূমিতে গিয়ে পড়া, হাতির মত সাহসী জন্তুও কাদায় পা বসে যাচ্ছে দেখলে, ভয়ে কাণ্ড-জ্ঞান রহিত হয়ে যায়। একটা দৃশ্য ঠিক যেন কালকের ঘটনার মত আমার স্পষ্ট মনে আছে। হাতির সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটি হবে, তখন গারো পাহাড়ের চোরাবালির মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে

লাগল, আমরা বন্য মহিষ আর জলাভূমির হরিণ-শীকারে বেরিয়ে ছিলাম, পথটা মাহুতদের পরিচিত। সেটা ভূমিকম্পের পরের বৎসর, খুব সম্ভবত পাহাড়ের উপরকার আলগা মাটি, বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচে এসে পড়েছিল। যে জায়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা সযত্ন রক্ষিত শাদ্বলের মত মনে হয়েছিল, সেটি কয়েক হাত গভীর চোরবালি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা তখনি শরবনে ঢাকা একটা জলাভূমি হতে সবে মাত্র বেরিয়ে এই সঙ্কট স্থানে এসে পড়লাম—অনতি দূরে হাতচল্লিশ তফাতে শুক্‌নো ডাঙা ছিল। প্রত্যেকটি হাতি প্রাণপণ চেষ্টায় অগ্রসর হতে লাগল—সবাই ভয়ে ডরে চীৎকার করতে করতে চলেছিল, যাদের পিঠে হাওদা ছিল সবচেয়ে দুরবস্থা হয়েছিল তাদেরি। এই দলের মধ্যে শ্রীহট্ট অরণ্যবাসিনী একটি হস্তিনী সব প্রথমে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছলে। এই বুদ্ধিমতী, বড় বড় ঘাসের বোঝা শুঁড়ের উপর নিয়ে পায়ের তলায় বিছিয়ে, পা, রাখবার ঠাঁই করে নিতে লাগল। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে উত্তীর্ণ হল, কিন্তু এই জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে তাদের এতই কষ্ট আর পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে, তার পর দুদিন আর তাদের চলৎশক্তি ছিল না। একটা খাল পার হতে গিয়ে রাজা—একটি হাতি হারালেন। সে পার-ঘাটার একটু দূরে পার হবার চেষ্টা করেছিল, বৃথায়; আস্তে আস্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাহুত শুধু প্রাণ হাতে করে, সাঁতার দিয়ে অপর পারে গিয়ে উঠল।

শীকার করতে গিয়ে প্রত্যেক শীকারীর প্রধান কর্ত্তব্য একে অপরকে প্রীতমনে সাহায্য করা। যদিই বা শীকার নিয়ে দুর্ভাগ্য-বশত, কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহলে শীকার-কর্ত্তা

এ সম্বন্ধে যে বিচার করেন, সেইটিই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের ন্যায্য দাবী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল, তবু কলহ করে মৃগয়া-শিবিরের শান্তি ও সন্তোষ হানি করা কখনো উচিত নয়। একটুকুও মন ভারী না করে নিজের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটি গ্রহণ করো। আর মনে করো সেইটিই তোমার পক্ষে সব চেয়ে বেশি সুবিধাজনক। স্বার্থপর অসন্তুষ্ট-চিত্ত লোকেরি "পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে"। নির্ব্বোধ কিম্বা মন্দমতির প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন না। গেল বৎসর আমারি চাক্ষুষ এই রকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল। খবর এল একটি প্রকাণ্ড বাঘ, বাথানের সবচেয়ে ভাল গরুটিকে মেরেছে, তার পর সেটিকে টেনে নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছে, হেঁটে নদী পার হয়ে শীকার শুদ্ধ এক শিমুল তলায় উঠেছে। আমরা সেদিন একটি আহত বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। আগের দিন আমাদের শীকার কর্ত্তা সেটিকে গুলি করেছিলেন—মারা পড়ে নি। সেই জন্যে সেদিন আমরা নতুন আগন্তুকের খোঁজে আর গেলাম না, যদিও সহজেই এ কাজটি সেই দিনই উদ্ধার হতে পারত। আমাদের শীকার-কর্ত্তা কিন্তু মৃগয়া-ব্যবসায়ীর সহজ সংস্কার বশতই হাতের কাজ শেষ করে, পরের দিনের অন্যটি স্থগিত রাখলেন। আহত বাঘটি তো পাওয়া গেলই, উপরন্তু সেই জঙ্গলেই আর একটিও আমরা মারলাম। ডাক্তার শেষের বাঘটির জন্যে প্রথম গুলির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু চরম-ঔষধ, নিদানকালের বিষবড়ি প্রয়োগ করবার ভার অন্যের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা আশাতীত ফললাভ করে আনন্দে তাঁবুতে ফিরে, পরের দিনের অভীষ্ট লাভের প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

গরুর হাড়ের খবর বাড়ীতে লিখবার মত প্রসঙ্গ নয়, বিশেষত তা হ'তে কাক কি কোকিলের এক দানা মাংসেরও প্রত্যাশা ছিল না। আমরা এই গো-হত্যাকারীকে পাহাড়ে, মাঠে, খানা খন্দে, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খুঁজে যখন বেলা দুটো পর্য্যন্ত কোন কিনারা করতে পারলাম না, তখন অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যাহ্ন-ভোজনের চেষ্টায় তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এই কারণে আমাদের লাইন হতে তিনটি হাতি কম পড়ে গেল। তাঁদের ফিরে আসতেও অনেক সময় কেটে গেল, আমাদের শীকার-নেতা এই সময়টি বৃথা অপব্যয় না করে, শীকারের সন্ধানেই ফিরছিলেন, বেলাও পড়ে আসছিল, তাই আর একটিবার মাত্র খোঁজে বেরবার মত সময় তখন হাতে ছিল। নদীটি যেখানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ঘুরে এসেছে, তারি তীরে, ঘাস আর শর দিয়ে ঢাকা একখণ্ড জমি ছিল। লম্বায় প্রায় তিন কি চারশ' আর প্রস্থে ১০০ কি ১৩০ গজ হবে। দুকোণায় জঙ্গলটি ফাঁক হয়ে এসেছে, গাছ পালা বড় একটা ছিল না। বাঘ যে পথে আসছিল, সেটা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ছিল, তাই আমাদেরও এগোবার লাইন নতুন করে হাতির মুখ ঘুরিয়ে, বিপরীত পথে যাত্রা করতে হল। আমি একেবারে লাইনের শেষে ছিলাম, ডানের দিকে খানিকটে খোলা ময়দান আর গো চারণের মাঠ ছিল। আমার বাঁয়ে তিনটি হাওদায় তিন জন শীকারী ছিলেন, উভয় দিক হতেই তাঁদের অধিকৃত স্থানগুলিকে, উত্তম, উত্তমতর আর অত্যুত্তম বলা যেতে পারে। পঞ্চম হাওদা যাঁর অধিকারে ছিল, তিনি নদীর পারে বিরাজ করছিলেন। আমি যে জায়গাটি পেয়েছিলাম, তাতে দৈব সুপ্রসন্ন না হলে কিছুই ঘটবার আশা ছিল না। সম্মুখে প্রায় ৮০

গজ পর্য্যন্ত ফাঁকা জমির মাঝে দুএকটি গাছের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল, সে যেন ঠিক ন্যাড়ার মাথায় অর্ক ফলার মত, এদিকে ওদিকে খোঁচ খোঁচ শূয়োরের কুঁচির মত খাড়া খাড়া দুএকটি গাছ, সমস্ত মাঠটির অনুর্ব্বরতা, আরো যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। নদীর বাঁক ধরে হাতির সারি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল, অল্প কালের মধ্যে বাঘের সান্নিধ্য যতই নিকটতর হতে লাগল, চারিদিকে উত্তেজনার আভাষ ততই দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হল। হাতীর হুঙ্কার, শুণ্ড আস্ফালন, প্রহরী জমাদারের ভঙ্গী হতেই বোঝা গেল যে বাঘ নির্দ্দিষ্ট পথে আসছে না, কিন্তু হাতির সারির মধ্যে যে স্থানটি সব চেয়ে নিরাপদ সেইখান দিয়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজছে। হাতিগুলি যেমন দৃঢ় ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সহজে সেখান হতে পলায়নের সুযোগ পাওয়া কঠিন। আমার সম্মুখের ঘাসবন ঈষৎ নড়ে উঠতেই, আমার সমস্ত শরীর যেন সতর্ক হয়ে উঠল, আমি রুদ্ধনিশ্বাসে একাগ্র দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করে রইলাম। দুএক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড আশ্চর্য্য সুন্দর শার্দ্দূল রাজের উত্তমাঙ্গ আমার দৃষ্টিগোচর হল। তখন সে দূরে, অনেক দূরে, সম্মুখের খোলা মাঠ দিয়ে সে যে আরো কাছে এগিয়ে আসবে, তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমার দৃষ্টি, মুষ্টি, মস্তিষ্ক সবই ঠিক ছিল— ৪৬৫ নং গুলি ছুটে গেল, ব্যাঘ্র রাজ কোথায়? কোথায় অদৃশ্য হলেন? না অদৃশ্য হন নি। বিরল তৃণরাজির মধ্যহতে দেখতে পেলাম, তিনি ধরাশয্যা গ্রহণ করেছেন, বিশাল শরীর নিস্পন্দ, জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। মাহুতকে হুকুম দিলাম "বাঢ়াও" ডান চোখের উপর একটি সামান্য ক্ষত চিহ্ন, নাক দিয়ে মস্তিষ্ক মিশ্রিত রক্তধারা বয়ে আসছে, শরীর পাথরের মত নিশ্চল, অসাড়।

ক্রমশ—

"আনন্দ মঠ"।

—:০:—

'বন্দেমাতরং' গানটিই হচ্ছে "আনন্দ মঠ"-এর মূল কথা, এমন কি এ উপন্যাসের চেয়ে গানটির মূল্য অনেক বেশি এই মত নাকি স্বয়ং বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন, এমনি একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা সত্য কিনা জানিনে কিন্তু এর মধ্যে যে সমালোচনাটুকু প্রচ্ছন্ন আছে, সেটা যে খুব সত্য সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। আনন্দমঠের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লিখেছিলেন, "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল"। কিন্তু আসলে তা প্রকৃত নয়। স্ত্রীলোক সকল সময়েই স্বামীর সহায় কিনা অথবা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্য ভগবানের ইচ্ছাতেই স্থাপিত কিনা এ সব কথা বোঝাবার জন্য উপন্যাস লেখবার দরকার ছিল না। এ সব সত্য প্রমাণ করবার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ বিস্তর অন্য উপায় ছিল। আশা করি এ কথা বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিম "আনন্দমঠে" কিছুই বোঝাতে চেষ্টা করেন নি, তাঁর মনে যে গভীর দেশভক্তি ছিল তাই তিনি আর্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ করবার চেষ্টা পেয়েছেন।

বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের মধ্যে আনন্দমঠ যে অধিকাংশ পাঠকের

এত ভাল লাগে তার কারণ আনন্দমঠে মাতৃবন্দনার যে সুরটি বেজে উঠেছে, সকলের মনেই তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। বস্তুত আনন্দমঠ আমাদের জাতীয় ইতিহাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে—তাই বঙ্কিমের অন্য উপন্যাস আলোচনা করতে আমরা যদি বা সাহস পাই—আনন্দমঠের সমালোচনা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অথচ এ কথা যেন ভুলে না যাই যে, দেশকে ভক্তি করে যদি দেশের সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা না করি তবে তাতে দেশেরই ক্ষতি হবে।

(২)

আনন্দমঠ আমাদের মনকে আকর্ষণ করে এ কথা সত্য, কিন্তু দেখতে হবে কোন্ গুণে আকর্ষণ করে। কেবল দেশের কথা আছে বলেই আমাদের ভাল লাগে, না দেশ-সেবার একটা মহৎ আদর্শ, দেশভক্তের একটা সর্ব্বত্যাগী বলিষ্ঠ স্বরূপ আর্টে ফুটে উঠেছে বলেই ভাল লাগে। দেশের কথা থাকলেই যাদের কাব্য বা উপন্যাস ভাল লাগে আমি তাঁদের দেশভক্তির প্রশংসা করি; কিন্তু অতি বিনীত ভাবে বলতে চাই যে, এই সব শ্রদ্ধেয় লোক যদি সাহিত্য-আলোচনা ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিতেন তবে যে-দেশকে তাঁরা এত ভালবাসেন সেই দেশের অনেক মঙ্গল হত। খুব সম্ভব তাঁদের মতে কংগ্রেসের বক্তৃতার চেয়ে উঁচু সাহিত্য পৃথিবীতে দুর্লভ। ইতিহাস গড়তে সাহায্য করলেই অথবা দেশভক্তি থাকলেই যে উপন্যাস বা কাব্য আর্ট হিসাবে বড় হবে না এ কথা সকলেরই জানা উচিত। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ইতিহাসে Uncle

Tom's Cabin-এর স্থান খুব উচ্চে; কিন্তু তাই বলে আর্ট হিসাবে ও-বই বড় নয়। "La Marseillese" ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করেছে, কোন দেশের ইতিহাসে কোন গান তা করে নি। কিন্তু তাই বলে "La Marseillese" যে কবিতা বলে গণ্য হয় নি সে কথা সকলেই জানেন। আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। "ভারত ভিক্ষা"তে ও "ভারত সঙ্গীতে" যতই দেশভক্তি থাক না কেন, আর্ট হিসাবে ও-দুই-ই অতি খেলো, একটি হচ্ছে বুড়ো স্ত্রীলোকের অনাবশ্যক নাকে চোখে অশ্রু বর্ষণ—অন্যটি যাত্রাদলের বীরপুরুষের হুঙ্কার—উভয়ই হাস্যজনক। আর্টে ও সাহিত্যে শিল্পীর কেবল উদার ভাব বা মহৎ সংকল্প থাকলেই চলে না, তার উপযুক্ত প্রকাশ চাই। এই প্রকাশের সফলতার উপরই আর্টের সফলতা নির্ভর করে। সাহিত্যের সমালোচনা কালে এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে, ওজঃগুণ সাহিত্যের একমাত্র গুণ নয়, এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। রান্নায় যেমন ঝাল, সাহিত্যে তেমনই ওজঃগুণ অক্ষমতা ঢাকবার উপায়। বিশেষত, বাঙলা সাহিত্যে সাধারণত আমরা যে ওজঃগুণে মুগ্ধ হই সে হচ্ছে বক্তৃতার ওজঃগুণ—চরিত্রের নয়।

(৩)

উনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে বঙ্কিম আনন্দমঠ লিখেছিলেন, সে সময়টা ছিল আমাদের পক্ষে আশা ও উদ্দীপনার যুগ। তখন টাট্‌কা Byron-এর কবিতা পড়ে ও Burke-এর বক্তৃতা পড়ে

আমাদের পক্ষে কেবল সহজ নয়, অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল। আমাদের তখনকার সাহিত্য এই অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। অথচ এই সব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না। তখনকার কাব্য-আলোচনা করলে এটা দেখা যায় যে, সকল উচ্ছ্বাসের চেয়ে বীরত্বের উচ্ছ্বাসটাই আমাদের সহজে আসত। আমাদের কবিরা উকীলই হউন বা হাকিমই থাকুন, যুদ্ধের প্রতি তাঁদের মনের একটু স্বাভাবিক টান ছিল। মাইকেল লিখলেন "মেঘনাদ বধ", হেমবাবু "বৃত্রসংহার", নবীনবাবু "পলাশীর যুদ্ধ"। বিদেশী কবিতা ও উপন্যাস পড়ে আমাদের মনে যে ভীষণ বীরত্বের উদ্রেক হয়েছিল, কাব্যে ও সাহিত্যে সেটা প্রকাশ না করে থাকবার উপায় ছিল না। এই Sentimentality-র যুগে আনন্দমঠের সৃষ্টি। বঙ্কিমের প্রতিভাও এই Sentimentality-কে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। আনন্দ-মঠের যা কিছু দোষ তার মূলে এই যুগের উল্লিখিত ভাবাতিশয্য। বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে, কপালকুণ্ডলায়, কৃষ্ণকান্তের উইলে—বঙ্কিমের লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা, তাঁর গল্প বলার অসাধারণ ভঙ্গী, এই ভাবাতিশয্য তেমন করে প্রকাশ হ'তে দেয় নি। কিন্তু আনন্দমঠের আখ্যায়িকা আমাদের সাহিত্যে এবং ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে নূতন। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি মানুষের চরিত্র ও তার স্বাভাবিক পরিণতির ইতিহাস, কিন্তু আনন্দমঠে তিনি যে সকল চরিত্রের অবতারণা করেছেন সে সকল সম্পূর্ণ তাঁর কল্পনাপ্রসূত, এখানে জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁকে এতটুকু সাহায্যও করে নি। আনন্দমঠ যে মহাবনের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই মহাবনের মধ্যে প্রার্থনা দিয়ে যে গল্প আরম্ভ হ'ল, আমার মনে হয় সেটা মোটেই প্রক্ষিপ্ত

নয়, এর পিছনে এই সত্য আছে যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে আনন্দমঠের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আনন্দমঠ স্বপ্নের মত সুন্দর হতে পারে, কিন্তু স্বপ্নের মত অশরীরি, অতএব আর্ট হিসাবে সার্থক নয়।

(৪)

আনন্দমঠ বঙ্কিমের হাতে কঠিন নির্ম্মম হওয়া উচিত ছিল—বঙ্কিমের হাতে এই জন্য বলছি যে, বঙ্কিমের প্রতিভাতে যে কেবল ব্রাহ্মণসুলভ শুচিতা ছিল তা নয়, ব্রাহ্মণসুলভ Austerity-ও ছিল। কিন্তু আনন্দমঠ Austere হয় নি। কুক্ষণে সত্যানন্দ প্রভু এত যত্ন করে "গীতগোবিন্দ" পড়েছিলেন। হয়ত যদি তেমনি যত্ন করে বেদ-ব্রাহ্মণ পড়তেন তাহ'লে আনন্দমঠ এতটা সৌখীন হ'ত না।

১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কথা দিয়ে আনন্দমঠ আরম্ভ হ'ল। পদচিহ্ন গ্রামের যে বর্ণনা আমরা পেলুম তা ভয়ঙ্কর। প্রখর রোদ, দোকানপাট বন্ধ, রাস্তা নির্জ্জন, বড় বড় বাড়ীগুলোতে জনমানব নেই। এই জনহীন নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্যে প্রকাণ্ড শূন্য বাড়ীতে মহেন্দ্র ও কল্যাণী। তারপর মহেন্দ্র ও কল্যাণীর পদচিহ্ন পরিত্যাগ—ডাকাতের হাতে পড়া—সেই ডাকাতের "চেহারা অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ" তাদের "অস্থিচর্ম্ম-বিশিষ্ট অতি দীর্ঘ শুষ্ক হস্তের শুষ্ক অঙ্গুলি"। আসন্ন বিপ্লবের রুদ্র সুর এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় বেশ বেজে উঠেছে। কিন্তু এ সুর শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা হয় নি। আমরা ভেবেছিলুম দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার করে, পৃথিবীকে ছিন্ন ভিন্ন করে, বজ্রগর্জ্জনে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়ে—প্রলয়ের

দেবতা আসবেন। তাঁর অসির আভায় বিদ্যুৎ চমকাবে, তাঁর রথের চাকায় লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন-প্রাণ পিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ঝড় এল না, এল জ্যোৎস্না রাত্রি, এল গেরুয়া বসন, গান, হাসি, রসিকতা।

আনন্দমঠের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা দুর্ব্বলতা, একটা সহজ সফলতার ভাব দেখা যায়। তাতেই সত্যানন্দ হ'তে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত কারো মধ্যে তপশ্চর্য্যার প্রখর তেজ দেখি নে, কোথায় সেই দাঁতে দাঁতে চাপা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—কোথায় বার বার পরাজয়েও অটল ধৈর্য্য। সন্তানেরা সন্ন্যাসী ছিলেন বটে কিন্তু তপস্বী ছিলেন না। বস্তুত কঠোর তপস্যার কোন প্রয়োজনই ছিল না। রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তাহা কঠিন—তার ফলেরও কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই সে বিদ্রোহের সঙ্গে গান রসিকতার কোন সম্পর্ক থাকা স্বতই অসম্ভব বলে মনে হয়। বঙ্কিম সন্তান-বিদ্রোহের বিপক্ষ মুসলমান-রাজশক্তি বা ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যবল কাউকেও যথেষ্ট পরাক্রমশালী না করাতে, সন্তানদের প্রয়াসের মধ্যেও যথার্থ বিক্রম প্রকাশ পায় নি। প্রায় সকল যুদ্ধে অতি সহজেই মুসলমানেরা হেরেছে। সন্তানেরা কোন গ্রামে উপস্থিত হওয়ামাত্র মুসলমানেরা হিন্দু হয়েছে। সন্তানদের নেতারা কোন দিন মুসলমানের হাতে তেমন করে পড়েন নি, পড়লেও এমন কি জেলে বন্ধ থাকলেও, অতি সহজে সন্তানেরা তাঁদের উদ্ধার করেছে। যে অত্যাচার সন্তান-বিদ্রোহের কারণ এবং যে অরাজকতার উপর সন্তানব্রতের সার্থকতা নির্ভর করেছিল তার ছবি আমরা পাই নে। অথচ এটাই হচ্ছে এ বইয়ের background. ঘন কালো background-এর উপর রক্তের

মত লাল রং-এ অগ্নিকাণ্ডের ছবি আঁকা উচিত ছিল; কিন্তু আকাশের কালো রং ফিঁকে হওয়াতে আগুনের রং লাল না হয়ে সুখস্বপ্নের মত গোলাপী হয়েছে। বিপক্ষেরা দুর্ব্বল হওয়াতে সন্তানেরাও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সর্ব্বাঙ্গে রাম নাম ছাপ দিয়ে, কপালে তিলক কেটে অতিকায়কে যে কবি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন, তিনি যে কেবল অতিকায়কে কাপুরুষ করলেন তা নয়, পাঠকদের মনে রামের বীরত্বের প্রতিও অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দিলেন।

(৫)

আনন্দমঠের দু'শ'পাতার মধ্যে প্রায় তিন চার বার যুদ্ধের কথা আছে। সন্তানেরা বেশির ভাগ সময়ে গান করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যার উদ্ধার সাধন করেছেন। এই সকল যুদ্ধের পিছনে যে কোন রাজ্য স্থাপনের বা রাজধানী অধিকারের লক্ষ্য ছিল, তা মনে হয় না, তবু আনন্দমঠে যদি কিছু action থাকে তবে এই যুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠ করলে দেখা যায় যে ঐ action-ও অতি মৃদু। পূর্ব্বেই বলেছি যুদ্ধের দিকে বাঙালী লেখকদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন বাঙালী লেখক যুদ্ধ-বর্ণনায় সফল হন নি। তবে মাইকেলের মেঘনাদ বধে কিম্বা হেমবাবুর বৃত্রসংহারে যে যুদ্ধ-বর্ণনা আছে সে হচ্ছে ধনুর্ব্বানের যুদ্ধ। সে যুদ্ধ দীর্ঘ ছন্দে দীর্ঘকাল ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করলে বিশেষ দোষ ধরা যায় না। রাম কি বাণ ছাড়লেন তারপর রাবণ কি করলেন—মহাকাব্যে সর্গের পর সর্গ এরূপ বর্ণনা দেওয়ার বিধি আছে। কিন্তু কামান গোলার যুদ্ধ যদি কেউ সেইরূপ গম্ভীর

অচল ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে বর্ণনা করেন তবে সেটা সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। নবীনবাবুর পলাশী যুদ্ধের বর্ণনায় "আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন" অথবা নবাব সৈন্যের যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষান্ত দিয়ে মোহনলালের দীর্ঘ বক্তৃতা "May be magnificent but it is not war"—চমৎকার হতে পারে কিন্তু যুদ্ধ নয়। বঙ্কিমও যে যুদ্ধ-বর্ণনায় সফল হন নি, তার প্রধান কারণ, তিনি যুদ্ধের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকের বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে চেষ্টা করব। এক যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য রক্ষার নিমিত্ত ভবানন্দকে কুড়িজন মাত্র সৈন্য নিয়ে পুল রক্ষা করতে হয়েছিল। বঙ্কিম লিখেছেন, "একা ভবানন্দ কুড়িজন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন; কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক, কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, যবন বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল—কিন্তু কুড়িজন সন্তান তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না"। কুড়িজন লোক নিয়ে এই যে rearguard action, এ যে কি strain তা কল্পনা করা কঠিন নয়। এই সামাল সামাল ভাব—সন্তান-সেনাপতিদের উদ্বেগ—বর্ণনায় একেবারেই প্রকাশ পায় নি, এমন কি বঙ্কিম এ ব্যাপারটাকে যেন অত্যন্ত সহজ করে ফেলেছেন। ভবানন্দ তোপ দখল করে হাততালি দিয়ে বলছেন "বন্দেমাতরং,"—আবার বলছেন,

"জীবানন্দ এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি"। যুদ্ধক্ষেত্রেও রসিকতা চলছে। যুদ্ধে ভবানন্দ প্রাণ দিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ধীরানন্দের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যুদ্ধ করছিলেন। আসল কথা সত্যানন্দ যে তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করেছিলেন সেটা মৃত্যুর পূর্ব্বে ভবানন্দকে না জানালে তাঁর প্রতি যে নিষ্ঠুরতা দেখান হত বঙ্কিম তাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধ যে বিশেষ ভয়ঙ্কর নয় তার প্রমাণ এই যে, বইয়ের শেষে দেখা গেল যে সন্তানদের প্রায় সকল নেতাই জীবিত রইলেন এবং সত্যানন্দের তিরোধানের পর যখন সন্তান-দল ভেঙ্গে গেল তখন খুব সম্ভবত সকলেই সুবোধ ছেলের ন্যায় ঘরে ফিরে চাকরীর চেষ্টা করলেন। মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর মিলন হল, তাঁরা পদচিহ্নে ফিরে গেলেন। জীবানন্দ মরে ছিলেন, তাঁকে বাঁচান হ'ল, না হলে শুভ মিলন হয় না,—তিনি ও শান্তি হিমালয়ে গেলেন। ধীরানন্দ জ্ঞানানন্দের মৃত্যুর কোন কথাই নেই, অতএব বোধ করি তাঁরাও বেঁচে রইলেন। এক ভবানন্দের মৃত্যু হ'ল—তবে তাঁর স্ত্রী-পুত্র নেই সুতরাং বিশেষ ক্ষতি হ'ল না।

(৬)

আনন্দ মঠের সঙ্গে যখনই আমাদের প্রথম পরিচয় হল—তখনই তা Complete. হাজার হাজার লোক সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করা হয়েছে—কামান সম্বন্ধে যে টুকু ত্রুটি ছিল, অতি সহজেই মহেন্দ্রকে দীক্ষিত করে সে অসুবিধাও আর রইল না। এখন

যুদ্ধ আরম্ভ করলেই জয়লাভ নিশ্চিত। এই সম্পূর্ণতার পিছনে কত বছরের নিষ্ফলপ্রয়াস, কত অত্যাচার, কত অবিচার ছিল বঙ্কিম তার আভাসও দেন নি, অথচ এই লক্ষাধিক সাধারণ সন্তান—যারা যুদ্ধ করেছে, লুট করেছে, বঙ্কিম যাদের পরিচয়ও দেন নি, সে সব লোক বর্ত্তমানের কোন দুঃসহ অত্যাচারের ফলে বা ভবিষ্যতের কোন মহিমান্বিত আদর্শের আকর্ষণে নিজের চির দিনকার ঘরকন্না, পুরুষানুগত সংস্কার ত্যাগ করে প্রলয়ের আহ্বানে ছুটে এসেছিল—প্রাণ দিতে। কোথায় ছিল পণ্ডিতের টোলে জীবানন্দ আর শান্তি, কোথায় ছিল প্রাসাদে মহেন্দ্র আর কল্যাণী, কোথায় ছিল ভবানন্দ, কত দ্বিধা কত চিন্তার পর তাঁরা সত্যানন্দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—তা আমরা জানি নে, কিন্তু একথা সত্য যে আনন্দ মঠের ঈষৎ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণু জগদ্ধাত্রী কালী ও দুর্গামূর্ত্তির সামনে সত্যানন্দের রূপক বক্তৃতার দ্বারা এ সকল সম্পাদিত হয় নি। এক মহেন্দ্রের দীক্ষা লওয়ার ইতিহাস আমরা পাই, তাও অতি বিচিত্র। আজন্ম ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত অতি সাধারণ লোক মহেন্দ্র, বেশি ইতস্তত না করে হঠাৎ দীক্ষা নিতে স্বীকার করলে। বাধা ছিল কল্যাণী, অন্য কোন স্বাভাবিক কারণের অভাবে এক স্বপ্ন দেখিয়ে কল্যাণীকে বিষ খাওয়ান হ'ল, মহেন্দ্রের দীক্ষার পথ নিষ্কণ্টক হ'ল।

(৭)

সন্তানদের মধ্যে আমরা যাদের পরিচয় পাই সে হচ্ছে সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও মহেন্দ্র, সমস্ত বইতে এঁরাই হচ্ছেন প্রধান পুরুষচরিত্র এবং সন্তানদের মধ্যে এঁরাই হচ্ছেন

সেনাপতি। যুদ্ধের সময়ে সব চেয়ে বেশি তরওয়াল ঘোরান এবং যুদ্ধান্তে বক্তৃতা দেওয়া আর সারং বাজিয়ে গান গাওয়া ভিন্ন এঁরা এমন কোন কাজই করেন নি, যাতে করে তাঁরা সেনাপতি হতে পারেন। সেনাপতির অপেক্ষা নভেলের নায়কত্ব এঁদের ভাল মানাত। সত্যানন্দ ও জীবানন্দ চমৎকার গাইতে পারতেন, ভবানন্দ দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন, বঙ্কিম তাঁর "ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রু শোভিত সুন্দর মুখমণ্ডলের" বর্ণনা দিয়েছেন, ভবানন্দও গাইতে পারতেন। মহেন্দ্র জমীদারের ছেলে, সেও বেশ গাইতে জানত, ধীরানন্দ বা জ্ঞানানন্দের এ সব গুণের কোন উল্লেখ নেই, তবে তাঁরা বড় দরের নেতা ছিলেন না। বঙ্কিম এঁদের এত সুকুমার করে সৃষ্টি করেছেন যে, মনে হয় যুদ্ধের মত দারুন নিষ্ঠুর ব্যাপারে এই সব সেনাপতিদের সুন্দর গেরুয়া বসনে কাদা লাগতে পারে। এঁরা যুদ্ধ করেছিলেন বটে কিন্তু "নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে" যুদ্ধ করেছিলেন —এঁদের সৈন্যদের অস্ত্রের ঝঞ্জনাও "ললিত তালধ্বনি সম্বলিত" ছিল। এই সব কবি-যোদ্ধারা যে যুদ্ধ জয় করতে পেরেছিলেন তার-কারণ টমাস, হে প্রভৃতি ইংরেজ-সেনাপতিরা এঁদের চেয়েও অকর্ম্মণ্য ছিল। অনেক সময়ে মনে হয় সন্তান-সেনাপতিরা এ ব্রত গ্রহণ না করে 'চির কুমার সভার" খাতায় নাম লেখালে—ঢের বেশি স্বাভাবিক হত। নায়িকাদের মধ্যে দেখতে পাই শান্তি সুন্দরী, বিদুষী; সত্যানন্দ জীবানন্দের তুল্য বলিষ্ঠ ছিলেন—সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ অধিকার, কারণ তিনি যে গান গাইতে পারতেন তা নয়, তবে "রাগ-তাল-লয় সম্পূর্ণ" করে গীতগোবিন্দ গাইতে পারতেন। কল্যাণীও সুন্দরী—তিনিও যে অল্প স্বল্প গাইতে না জানতেন তা নয়, কারণ বিষ খেয়ে

মৃত্যুর পূর্ব্বেই "অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠে" মোহভরে ডাকিতে লাগলেন —হরেমুরারে মধুকৈটভারে। তিনি শান্তির মত সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করেন নি, তবে নানা রকম গুরুতর কাজ সত্বেও সন্তানদের নেতাদের কল্যাণীর বিদ্যা শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁকে ব্যাকরণ, অভিধান এবং গীতা পড়ান হত। বঙ্কিম সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থাতেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি করেছিলেন। বোধ করি তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যুদ্ধই কর আর যাই কর না কেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা"।

(৮)

সত্যানন্দকে দল থেকে একটু আলগা রেখে, একটু উচুঁতে দাঁড় করান বোধ হয় বঙ্কিমের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু, অনেক সময়ে সে উচ্চতা রক্ষা হয় নি। নবীনানন্দ বেশে শান্তি যখন দীক্ষা গ্রহণ করল তখন সত্যানন্দ তার ছদ্ম বেশ ধরতে পারেন নি—যদিও পরে বলেছিলেন, "যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এ কাজে হাত দিতাম"। তার পর জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ যে ধনুকে গুণ চড়াতে পারতেন, শান্তি যখন সে ধনুকে গুণ দিল, তখন সত্যানন্দ যে কেবল বিস্মিত হয়েছিলেন তা নয়, ভীতও হয়েছিলেন। দাড়ির প্রাচুর্য্যে শান্তির প্রকৃত পরিচয় যখন প্রকাশ পেল তখন তার সঙ্গে তর্ক বিতর্কে সত্যানন্দ যেন খেলো হয়ে পড়লেন। আর একবার জীবানন্দের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তিনি শান্তিকে বলেছিলেন, "মা দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে,

আমি সকল জানি। তোমার 'প্রলোভনে' তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে"। হ'তে পারে কার্য্যোদ্ধারের উপায় এই, কিন্তু এ সব কৌশল সত্যানন্দের মুখে মানায় নি। সমস্ত সন্তান-সম্প্রদায় যাঁকে অবতারের মত ভক্তি করত, হিমালয়ের গুহায়, আনন্দ-কাননে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা যাঁকে সন্তানব্রতে ব্রতী করেছিলেন, তাঁর সামান্য কথা আদেশ বলে মান্য হওয়া উচিত ছিল। শান্তির সঙ্গে বাদানুবাদে এ সব অনুনয় বিনয় তাঁকে মোটেই শোভা পায় নি। এতে মনে হয় যে অন্তরে যে প্রেরণা, যে মহত্ব থাকলে মুখের কথা দৈববাণী হয়ে ওঠে, সত্যানন্দের তা ছিল না। মাঝে মাঝে বঙ্কিম সত্যানন্দকে অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলে দাঁড় করিয়েছেন। আবার পাছে বইর বাস্তবতা নষ্ট হয় তাই অলৌকিকতা বাদ দিয়ে কৌশলে ঘটনাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। ভবানন্দ যে কল্যাণীকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল, এ কথা সত্যানন্দ জানতে পারেন; কি করে জেনেছিলেন সেটা বঙ্কিম প্রথমটা বলেন নি। অন্ধকার রাত্রে বনমধ্যে ভবানন্দ যখন প্রার্থনা করেছিলেন যে, ধর্ম্মে যেন তাঁর মতি থাকে তখন অদৃশ্য সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। সে সময়ে মনে হ'ল যেন সত্যানন্দ অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা ভবানন্দের মনের অবস্থা জানতে পেরেছিলেন। তার পর জানা গেল যে, যে সময়ে ভবানন্দ কল্যাণীকে ও-সকল কথা বলেছিলেন তখন সত্যানন্দ কল্যাণীকে গীতা পড়াচ্ছিলেন। সম্ভবত ভবানন্দ যাওয়াতে পাশের ঘরে লুকিয়ে কথাটা শুনেছিলেন। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন ভবানন্দের প্রার্থনার উত্তরে

অদৃশ্য সত্যানন্দ "অতি মধুর অথচ গম্ভীর মর্ম্মভেদী কণ্ঠে" তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তখন হঠাৎ বনমধ্যে সত্যানন্দের কথা শুনে ভবানন্দের রোমাঞ্চ হয়েছিল এবং সত্যানন্দকে অনেক ডেকেছিলেন কিন্তু সত্যানন্দ কোনো জবাব দেন নি। যদি সত্যানন্দের কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই থাকে তবে এ সকল sensationalism-এর দরকার ছিল না—লুকিয়ে কথা শোনাতে, অস্বাভাবিক যায়গায় অপ্রত্যাশিত ভাবে অদৃশ্য থেকে হঠাৎ কথার জবাব দেওয়াতে যেন মনে হয় সত্যানন্দ অলৌকিক ক্ষমতার ভাণ করছিলেন। এই সকল clap trap সত্যানন্দকে আরও হীন করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, সত্যানন্দ প্রভুর কি কাজ ছিল না—তীর্থপর্য্যটনের কথাটা না হয় মেনেই নিলাম, কারণ তাঁর অন্য উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল যখন অনিশ্চিত, বহু বাধা বিপদের মধ্য দিয়ে তবে হয়ত দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা যাবে, হয়ত চেষ্টা সফল হবে না, এমনি সময়ে বিদ্রোহীদের নেতাকে কল্যাণীর বিদ্যা শিক্ষার প্রতি এত মনোযোগ না দিলেও ক্ষতি ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, তীর্থপর্য্যটন থেকে ফিরে এসে প্রথমেই সত্যানন্দকে দেখা গেল গৌরী দেবীর বাড়ীতে কল্যাণীকে পড়াতে ব্যস্ত। সত্যানন্দ তখন আনন্দমঠেও যান নি। কল্যাণীর ঘরে ভবানন্দের সাক্ষাৎ হত, তাও তিনি করলেন না—বোধ হয় ভবানন্দ কি করে তাই দেখবার জন্যে। তা ছাড়া কল্যাণীর গীতাপাঠ না থাকলেও মহেন্দ্র-কল্যাণীর দাম্পত্য জীবনে বিশেষ গোলযোগ হবার ত কোন সম্ভাবনা ছিল না—হয়ত বা কল্যাণী বেশি শাস্ত্র পাঠ করলেই গোলযোগ হত, কারণ মহেন্দ্র বেচারাকে আমরা যতদূর জানি সে শাস্ত্র টাস্ত্র কিছুই জানত না। দীক্ষার পূর্ব্বে মহেন্দ্রকে প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বোঝাতে সত্যা-

নন্দ প্রভুর অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। যা হোক, কল্যাণী তখন স্বামী-কন্যার কোনো খোঁজ না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ। বঙ্কিম আধ পাতা ভ'রে সে বিষণ্ণতার বর্ণনা দিয়েছেন। এমন অবস্থায় গীতার নির্লিপ্ততা শিক্ষা কল্যাণীর পক্ষে দরকার ছিল সন্দেহ নেই, তবে গীতা-পাঠের মত মনের অবস্থা তখন তার ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গল্পের ধারা ঝরণার মত চালিয়ে নিতে যে বঙ্কিমের তুল্য লেখক বঙ্গসাহিত্যে নেই, সেই বঙ্কিম আনন্দমঠে এমন সকল অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়েও গল্পের ধারা রক্ষা করতে পারেন নি। খুব সম্ভবত সত্যানন্দের নানাবিধ দুর্ব্বলতা বঙ্কিম বুঝেছিলেন এবং সেই কারণেই আবার এক চিকিৎসককে এনে এবং সন্তানব্রতের আরম্ভটাকে অলৌকিক রহস্যে আবৃত রেখে সমস্ত চেষ্টাকে গৌরব দিতে চেয়েছিলেন।

(৯)

সন্তানদের নায়কদের মধ্যে কারো character-ই বেশ স্বাভাবিক হয় নি। তবে মহেন্দ্রের চরিত্র অন্যের চেয়ে ফুটেছে। নানা রকম ভদ্রোচিত সংস্কারের মধ্যে আজন্ম পালিত মহেন্দ্র সন্তানদের হাতে পড়ে সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের বেশি বদল হল না। মহেন্দ্র সে রকম করে দলে মিশতে পারলেন না। জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি কাজেকর্ম্মে এমন কি নামে যেমন আনন্দ মঠের সঙ্গে জড়িত, মহেন্দ্র তেমন জড়িত হন নি। নীরব ভাল মানুষ মহেন্দ্রের মুখে বঙ্কিম কোন বীররসাত্মক বক্তৃতা দেন নি, এমন কি শেষ যুদ্ধে প্রথমে যখন সন্তানেরা পলায়ন করছিল এবং পরাজয় যখন অনিবার্য্য বলে মনে হয়েছিল, তখন জীবানন্দ মহেন্দ্রকে

বলেছিলেন "এস এইখানে মরি"। মহেন্দ্র বলেছিলেন "মরিলে যদি রণ-জয় হইত তবে মরিতাম। বৃথা মৃ ু বীরের ধর্ম্ম নহে"। অথচ অনাড়ম্বর ভাবে মহেন্দ্রই সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করে-ছিলেন। মহেন্দ্রের মত লোকেরা হয়ত বোঝে কম, জীবানন্দ ভবানন্দের মত প্রতিভাশালী নয়, কিন্তু একবার বুঝলে এ শ্রেণীর লোকদের মন থেকে সে শিক্ষা দূর হয় না। জীবানন্দ ভবানন্দ নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন কিন্তু মহেন্দ্র তা করেন নি। জীবানন্দ ভবানন্দ যা করেন খুব চটপট করেই করেন, মহেন্দ্রের কিন্তু দ্বিধার অন্ত ছিল না এবং সে দ্বিধার পেছনে ছিল তাঁর সংস্কার ও শিক্ষা। মহেন্দ্রের সঙ্গে ভবানন্দের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। ভবানন্দ সিপাহীদের হাত হ'তে মহেন্দ্রকে উদ্ধার করেন, তার পর যখন সিপাহীদের সঙ্গে সন্তানদের যুদ্ধ বাধে, মহেন্দ্র সন্তানদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময়ে তাঁর মনে হল যে সন্তানেরা দস্যু। মহেন্দ্র জানতেন যে ডাকাতি করা অন্যায়, অমনি তিনি সরে দাঁড়ালেন। • এতক্ষণ সিপাহীরা যে তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা ভবানন্দই যে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন এ সব কথার চেয়ে নীতি-শিক্ষার "চুরি করা মহা পাপ" এই শিক্ষাই প্রবল হল। আর একবার কল্যাণীর সঙ্গে মিলনের পর পদচিহ্নে নিজের অন্তপুরে কল্যাণীর শয়নগৃহে নবীনানন্দ বেশে শান্তিকে দেখে মহেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত ও রুষ্ট হয়েছিলেন, তারপর যখন কল্যাণী নিজে নবীনানন্দের বাঘছাল খুলে দিতে লাগলেন তখন মহেন্দ্রের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা মুস্কিল হল। নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করল—"কি গোঁসাই, সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস"! মহেন্দ্র বললেন—"ভবানন্দ ঠাকুর কি অবিশ্বাসী ছিলেন"?

অর্থাৎ বিশ্বাস টিশ্বাসের কথা ছেড়ে দাও, আমি এসব পছন্দ করি নে। নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করল, "কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে"? জীবানন্দ বা ভবানন্দ খুব সম্ভবত এ অবস্থায় পড়লে, হয় সত্যই বিশ্বাস করতেন, না হয় নবীনানন্দের গলা ধরে বাড়ী থেকে বের করে দিতেন, কিন্তু মহেন্দ্র ফস করে মিথ্যা কথা বলে বসলেন, "কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম, কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল তাই আসিয়াছি"। আসলে মহেন্দ্র মহা বিপদে পড়েছিলেন, তিনি বিরক্ত বোধ করেছিলেন কিন্তু ভাবলেন "যে কল্যাণী একদিন অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল, সে কি অপরাধিণী হইতে পারে"? আমার মনে হয় কল্যাণীর বিষ ভোজনটা মহেন্দ্র নিছক দুঃখ হিসাবে গণ্য করেন নি, অবশ্য কল্যাণীর মৃত্যুতে তাঁর খুব আঘাত লেগেছিল সন্দেহ নেই, তবু মনে মনে এই জন্য একটু আত্মপ্রসাদও অনুভব করেছিলেন যে, আমার স্ত্রীর মত পতিপরায়ণা সতী স্ত্রী কার, যে আমার ব্রত-সেবার পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য এক মুহূর্ত্তে বিষ খেল, সে কি সোজা কথা। আর কারো স্ত্রী করুক দেখি। মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখে শান্তি আত্মপরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিল, অবশেষে "সাহসে ভর করিয়া নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিল", শান্তির ছদ্মবেশ ধরা পড়ল। কিন্তু তবু নিস্তার নেই, নিজের স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু জীবানন্দ ঠাকুর কেন শান্তির সঙ্গে সহবাস করেন, এই ভেবে মহেন্দ্র ভারি বিষণ্ণ হলেন। কল্যাণী শান্তির পরিচয় দিল, "মুহূর্ত্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, "ইনি ব্রহ্মচারিণী"। যাহোক বাঁচা গেল, মহেন্দ্র এই ভেবে নিশ্চিন্ত

হলেন যে ভুলক্রমেও সে কোন দিন দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মেশেন নি। যে সব লোক দিব্যি খেয়েদেয়ে দিনে ঘুমিয়ে পান চিবিয়ে জীবন কাটায় এবং নীতিপাঠের সকল নীতিগুলি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পালন করে' পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারে, মহেন্দ্র সেই জাতের লোক। যে মহেন্দ্রের উচিত ছিল উকীল কি অধ্যাপক হওয়া, সেই মহেন্দ্র হঠাৎ এক দিন সন্তানব্রত গ্রহণ করলেম অথচ বঙ্কিম তার কোন জবাবদিহি করা দরকার বোধ করেন নি। মহেন্দ্রকে বঙ্কিম অনেক বিষয়ে অবহেলা করেছেন। এই অবহেলাতেই মহেন্দ্র একটা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন কিন্তু মনোযোগ দিলে মহেন্দ্র একটা ঘোরতর বীরপুরুষ বা মহাপুরুষ হয়ে উঠতেন এবং সেই পরিমাণে অস্বাভাবিক হতেন। আনন্দ মঠের মহাপুরুষদের গীতাপাঠ, হরিসংকীর্ত্তন, সুন্দর চেহারা এবং মাঝে মাঝে যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব ও বক্তৃতা পড়ে পড়ে মহেন্দ্রকে ভালই লাগে এ কথা স্বীকার করতে আমাদের লজ্জা নেই।

পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্র সৃষ্টিতেই যে বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত ছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। এই নারীচরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিম আশ্চর্য্য সাহস দেখিয়ে ছিলেন। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে যখন স্ত্রীলোক অর্থে আমরা অবলা, সরলা, পতিব্রতা, পাঁচ ছেলের মা'র কথা ভাবতুম সেই যুগে ভ্রমর, শৈবলিনী, দেবীচৌধুরাণী, কুন্দ, রোহিণী—এদের ছবি আঁকা যে কঠিন ছিল এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বঙ্কিম মেয়েদের কেবল স্বাধীনা করেন নি, সবলাও করেছেন। শান্তিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে, দেবী চৌধুরাণীকে ডাকাতের সর্দ্দারি করিয়ে ক্ষান্ত হন নি, এমন কি দলনীকে দিয়ে তকিখাঁকে পদাঘাত

করিয়েছেন, মৃণালিনীকে দিয়ে হৃষীকেশকে পদাঘাত করিয়েছেন। কিন্তু নারীচরিত্রেও আনন্দমঠ অন্য সকল উপন্যাস অপেক্ষা হীন। ভ্রমর, শৈবলিনীর সঙ্গে শান্তি ও কল্যাণীর তুলনাই হতে পারে না। কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর কিম্বা চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, রাজসিংহে চঞ্চলকুমারী—সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রের মত। তাদের বাদ দিয়ে ও-সকল বই লেখাই হতে পারে না। আনন্দমঠে কল্যাণীর স্থান খুব সঙ্কীর্ণ—তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন নেই; কিন্তু শান্তি অনেকটা জায়গা অধিকার করেছে। জীবানন্দ, সত্যানন্দ সকলেই তার কাছে মাথা হেঁট করেছেন অথচ এই বইতে তার প্রয়োজন ছিল না। তার সমস্ত লাফালাফি, ঘোড়ায় চড়া, সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা নিয়েও সে একেবারে অনাবশ্যক। শান্তিকে বাদ দিলে আনন্দমঠের কোন অঙ্গহানি হ'ত না। জীবানন্দের সঙ্গে মিলে সে এমন কোনো কাজই করে নি যা আর যে-কোন সন্তান করতে পারত না। আসলে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করা, কুস্তিগীর, নির্লিপ্তার একটা আদর্শই বঙ্কিম সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। শান্তিতে তার আরম্ভ—দেবীচৌধুরাণীতে তার পরিণতি। প্রথম যখন তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, প্রগল্‌ভা স্ত্রীলোক গড়েছিলেন তখন সে বেশ হয়েছিল কিন্তু যাই তাকে গীতা পড়িয়ে, কুস্তি শিখিয়ে, ঘোড়ার উপর চড়ালেন তখনই সে কেবল অবাস্তব নয়, অস্বাভাবিকও হয়ে পড়ল।

আনন্দমঠের মূল কল্পনার মধ্যে যে, কেবল ভাবাতিশয্য দেখা দিয়েছে তা নয়—অনেক সময় ঘটনা ও বর্ণনার মধ্যে তা অতিরিক্ত প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমের অনেক বইতেই একটু থিয়েটারি ঢং দেখা যায়—যেমন কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে গুলি করবার পূর্ব্বে

গোবিন্দলালের বক্তৃতা। আনন্দমঠে কল্যাণীর বিষ পানের দৃশ্যটাও প্রায় বাঙলা থিয়েটারের দৃশ্য হয়ে পড়েছে। কল্যাণী বিষ পান করে মহেন্দ্রের সঙ্গে duet গাইতে আরম্ভ করলেন, ইতিমধ্যে সত্যানন্দ এসে উপস্থিত হলেন, তিনিও যোগ দিলেন। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি যে ষ্টেজের অন্তরালে ক্ল্যারিওনেট এবং বাঁয়া তবলা বাজতে লাগল এবং গানটা শেষ হবার পূর্ব্বেই টেরিকাটা, লালগেঞ্জীর উপর মিহি পাঞ্জাবী-পরা দর্শক বাবুরা "এনকোর" "এনকোর" বলে চীৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু কিছু পরে যখন মহেন্দ্র গিয়ে হঠাৎ সত্যানন্দের কোলে বসল তখনকার দৃশ্যটা বাঙলা থিয়েটারের দর্শক মহাশয়রাও সহ্য করবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।

আনন্দমঠের শেষ হ'ল ট্র্যাজেডিতে—দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সকল বাধা যখন দূর হয়ে গেল তখনই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজল। ইতিপূর্ব্বে আর একদিন বিদায়ের আহ্বান এসেছিল। সত্যানন্দ বলেছিলেন—"হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘীপূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব"। সেই মাঘীপূর্ণিমায় আবার যখন আহ্বান এল তখন না মেনে উপায় ছিল না। যুদ্ধ জয়ের পর কাউকেও কিছু না বলে সত্যানন্দ আনন্দমঠে একা ফিরে এসে বিষ্ণুমন্দিরে ধ্যানে বসলেন, তার পরে সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সামনে ক্ষীণালোকে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে নিয়ে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। সেই নিস্তব্ধ পাষাণ মন্দিরে স্তিমিতালোকে বিষ্ণুর অঙ্কে মোহিনী মূর্ত্তির চোখ থেকে অশ্রুকণা ঝড়ে পড়েছিল কিনা কে জানে। সেই জনহীন, শব্দহীন, মহারণ্যের মধ্যে পড়ে রইল নিরানন্দ আনন্দমঠে পূজাবিহীন দেবতা, আর পড়ে

রইল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের নীচে হাজার অখ্যাত অজ্ঞাত সন্তানের মৃত দেহ।

আনন্দমঠের দোষের কথাই আলোচনা করা গেল কিন্তু এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, আমরা বঙ্কিমের প্রতিভাকে হীন মনে করেছি। সত্যানন্দের প্রয়াসের বিপুলতা অক্ষুণ্ণ থাকুক—বঙ্কিমের প্রয়াসের বিপুলতা বাঙালীর কাছে অজ্ঞাত নয়। বঙ্কিমের প্রতিভা ত কেবল আনন্দমঠ সৃষ্টি করে নি—চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষের সঙ্গে আনন্দমঠ পড়লে সে প্রতিভার বিপুলতা বোঝা যায়। আনন্দ মঠের সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও একথা আমরা ভুলতে পারব নাত যে, "ভারতভিক্ষা" ও "ভারত বিলাপের" দিনে বঙ্কিম মাতাকেই বন্দনা করেছিলেন এবং সুবর্ণনির্ম্মিত দশভুজা জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিয়ে বলেছিলেন—"এই মা, যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ ধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিণী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী এস আমরা মাকে প্রণাম করি"।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

উপকথা।

—:*:—

মানুষ ছিল একদিন অতি নির্ব্বোধ, তাই সে তার পাশের সঙ্গিনীটিকে রেখেছিল কৃতদাসী ক'রে। তার পায়ে সে বেঁধে দিয়েছিল লোহার শিকল—এমনি একটু লম্বা যে ঘরের কাজে সে এদিক ওদিক করতে পারে ; কিন্তু বাইরে দৌড়ে ছুটে না পালায়।

সঙ্গিনীটিও থাকত, ঠিক কৃতদাসীর মতই।

তার মনের কথা কে জানে? মানুষের কুটীরখানি সে মেজে ঘসে ধুয়ে মুছে চকচকে ঝকঝকে করে রাখত। উঠানে নিজ হাতে তুলসীগাছ গোড়ায় প্রতি সন্ধ্যায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে সকল অমঙ্গলকে দূরে রাখবার প্রার্থনা জানাত। মানুষের ক্ষুধার আহার জুগিয়ে দিত, তৃষ্ণার জল এনে দিত, পূজোর ফুল সাজিয়ে দিত। মানুষ মনে মনে ভাবত, ও যে আমার জন্যে এত করে, তা আমি না হ'লে ওর চলে না বলে'।

মানুষের মনের কথা জেনে বিধাতা মনে মনে হাসলেন। তিনি মজা করবার জন্যে একদিন সঙ্গিনীটিকে তার পাশ থেকে সরিয়ে নিলেন।

মানুষ সে দিন কুটিরে ফিরে এসে দেখলে যে, ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই।

দেখে মানুষ একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি, চেঁচিয়ে ঘর মাথায় করলে ; কার সঙ্গে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে তা খুঁজতে লাগলে। এমন সময় বিধাতা এসে

উপস্থিত হলেন। নিতান্ত ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি? মানুষ রেগে বলে উঠল,—ব্যাপার কি? কোথায় গেল আমার সে? ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর ফুল নেই, সেই যে সব করত।

বিধাতা বললেন—কেবল এই?

মানুষ বললেন—তা নয় ত কি!

বিধাতা বললেন—বেশ তুমি সবই ঠিক ঠিক পাবে। তোমার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, সব, কিছুরই ত্রুটি হবে না।

বিধাতার মন্ত্রগুণে মানুষ সব ঠিক ঠিক পেতে লাগল—তার ক্ষুধার আহার তৃষ্ণার জল পূজোর ফুল—সব ঠিক ঠিক আগেরই মত।

কিন্তু সঙ্গিনীটি আর ফিরলে না।

সেই ঠিক ঠিক সবই রইল—ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, কিন্তু সেই সুরটি ত তেমন করে বাজে না। সেই সুরটি—যে সুরটি তার আহার ও পানের মাঝামাঝি বিচ্ছেদটুকুকে পূর্ণ ক'রে রাখত, তার পান ও পূজোর মাঝামাঝি অবসরটুকুকে সন্তোষ আর তৃপ্তি দিয়ে ভরিয়ে দিত। আজ এ যে আহারের পিছনে কেবল আহারই আছে, জলের পিছনে কেবল জল, ফুলের পিছনে কেবলই ফুল—মূর্ত্তিমতী নিষ্ঠুরতার মত, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়, হৃদয়হীন যন্ত্রের মত আপন আপন কর্ত্তব্য ক'রে যায়।

বাইরের কাজ সেরে মানুষ সেদিন ক্লান্তদেহে তার কুটীরে ফিরে এলো, দেখলে সব ঠিক ঠিক সাজান,—তার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কে চায়, কে চায় তোমার এ সব? কে চায়, কে চায় তোমার এই হৃদয়হীন বিদ্রূপ? কে চায়, কে চায় তোমার এই যন্ত্রচালিত নির্দ্দয়তা?

লাথি মেরে সে তার সমস্ত খাবার ছড়িয়ে দিল—জলের পাত্র উলটিয়ে দিল, ফুলের রাশি ছয়-নয় ক'রে দিল।

বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন, বললেন—আবার ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি? মানুষ ক্রুদ্ধস্বরে বললে,—ব্যাপার কি? কে চায় তোমার এ সব? নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার ওই হৃদয়হীন ভোগ-সামগ্রি। আমার তাকে ফিরিয়ে দাও।

বিধাতা হাসলেন। তার সঙ্গিনীটিকে আবার ফিরিয়ে দিলেন।

মানুষ সে দিন তার সঙ্গিনীটির পা থেকে লোহার শিকল খুলে নিয়ে তার হাত দু'খানিতে সোনার কাঁকন পড়িয়ে দিল, তার গলায় মুক্তাহার দুলিয়ে দিল, তাকে বক্ষে চেপে চুম্বন ক'রে বললে,—তুমি ত কৃতদাসী নও, তুমি যে পূর্ণা, তুমি অসম্পূর্ণকে পূর্ণ কর, তুমি শূন্যকে সম্পদশালী করে তোল, তুমি কৃতদাসী নও।

সে দিন মানুষ যে ফুল দিয়ে পূজো করতে বসল, সে ফুলের গন্ধে দেবতা জাগ্রত হয়ে উঠলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।